জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস)

শিক্ষক সহায়িকা

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

Kingdom of the Netherlands
Canada
WITH FUNDING FROM AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION
UNFPA
PLAN INTERNATIONAL

জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস)

শিক্ষক সহায়িকা

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প

দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৯

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক পরিমার্জিত ও অনুমোদিত

কারিগরি সহায়তা

- ডা. মুহাম্মদ মুনীর হোসেন
  প্রোগ্রাম এ্যানালিস্ট, এডোলেসেন্ট এন্ড ইয়ুথ
  ইউএনএফপিএ, বাংলাদেশ
- মুরশীদ আকতার
  হেড অফ এডুকেশন প্রোগ্রাম
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- ডা. অনন্যা আসাদ
  এ্যাসিস্টেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- মাহেনূর আলম চৌধুরী
  ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্পেশালিস্ট
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- নন্দিনী লোপা
  টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট- এসআরএইচআর
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- শামীমা আক্তার শাম্মী
  জেন্ডার এন্ড ইনক্লুশন এ্যাডভাইজার
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- নুর মোঃ ফেরদৌস চৌধুরী
  টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট- এসআরএইচআর
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- বাসনা মারমা
  নিউট্রিশন স্পেশালিস্ট
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ডিজাইন ও অলংকরণ

- খাদেমুল জাহান
  শিল্প নির্দেশক ও ডিজাইনার
- নুসরাত আমিন
  কমিউনিকেশন ম্যানেজার
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রকাশনা

- প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

সার্বিক নির্দেশনা

- প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
  পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অ.দা.)
  ও প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.)
  জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প- পর্যায় ২
  মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সম্পাদনা ও পরিমার্জন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

- প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
  চেয়ারম্যান
- প্রফেসর মোঃ মশিউজ্জামান
  সদস্য (শিক্ষাক্রম)
- প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
  সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)
- সৈয়দ মাহফুজ আলী
  উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
- প্রফেসর মেহের নিগার
  উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
- প্রফেসর মোঃ হাবিবুল্লাহ
  উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
- পারভেজ আক্তার
  বিশেষজ্ঞ
- ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
  বিশেষজ্ঞ
- প্রফেসর সাহানা আহমেদ
  গবেষণা কর্মকর্তা
- প্রফেসর জারিয়াতুল হাফসা
  গবেষণা কর্মকর্তা
- প্রফেসর ড. সালমা জোহ্‌রা
  কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ
- শাহান আরা হূদা
  কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ
- রুমী জেসমিন
  কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ
- কানিজ ফৌজিয়া খানম
  গবেষণা কর্মকর্তা
- মোঃ আনিসুর রহমান
  গবেষণা কর্মকর্তা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
  প্রকল্প পরিচালক, জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প- পর্যায় ১
  মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
- দিল আফরোজ বিনতে আছির
  সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
  মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
- মোঃ আজিম কবীর
  গবেষণা কর্মকর্তা (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
  মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
- মোফাবেজা খান
  নির্বাহী পরিচালক
  কনসার্নড উইম্যান ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট
- ডা. ইখতিয়ার উদ্দিন খন্দকার
  হেড অফ হেল্‌থ প্রোগ্রাম
  প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
- ইসরাত জাহান বাকী
  লিয়াজোঁ অফিসার, গ্লোবাল ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি
  ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ

বাণী

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
শিক্ষা ভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

একটি জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কিশোর-কিশোরীরা মূল সম্পদ। এই কিশোর-কিশোরীদের একটি বড় অংশ শিক্ষার্থী। এরা অতিক্রম করছে বাল্য ও যৌবনের অন্তর্বর্তী বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। এ সময়ে দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন ঘটে যার মাধ্যমে মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার পাশাপাশি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত হওয়ার জন্য এদের প্রয়োজন পূর্ব প্রস্তুতির। দরকার তাদের শরীর ও মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ, যাতে এই উঠতি বয়সে শরীর ও জীবন সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণা বা তথ্য নিয়ে বিপাকে পড়তে না হয়। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য কিশোর-কিশোরীদের মাঝে জেন্ডার সমতার মূল্যবোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত জরুরি।

মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এখনও কতিপয় চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা নিরসনে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের অনেক কিশোর-কিশোরী বৈষম্যমূলক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বড় হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়। তাছাড়া যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়ার কারণে অথবা ভ্রান্ত তথ্যের কারণে কিশোর-কিশোরীরা তাদের জীবন চলার পথে বিভিন্ন ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। কিশোর কিশোরীদের শরীর ও মনের সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশ লাভের জন্য জেন্ডার সমতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের অর্থায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার ৩০০ টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৫০টি মাদ্রাসায় সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রজনন স্বাস্থ্য ও জেন্ডার বিষয়ক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য তথ্য ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নতুন ২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২য় পর্যায়ে জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙামাটি জেলার ২১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৪০টি মাদ্রাসা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতায় প্রণীত 'জেমস শিক্ষক সহায়িকা (সবার জন্য জেন্ডার সমতা)' ম্যানুয়াল কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার সমতা, বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন, সহিংসতা প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যানুয়ালের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত।

পরিশেষে, 'জেমস শিক্ষক সহায়িকা (সবার জন্য জেন্ডার সমতা)' ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন ও প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রিয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)

বাণী

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের প্রাথমিক ধাপ হলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে দেশের কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এদেশের কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এখনো কতিপয় চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান এবং তা নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সঠিক তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির সীমিত সুযোগ কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা তাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের জীবনে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। সেজন্য জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর অর্থায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। ঢাকা মহানগরী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার ৩০০টি স্কুল এবং ৫০টি মাদ্রাসায় ২ বছর ব্যাপী এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞবৃন্দ জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন করেছিলেন। জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের ফলাফল মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি এনসিটিবি'র বিশেষজ্ঞগণ পরিমার্জন ও উন্নয়ন করেছেন। সেই পরিমার্জিত প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি মুদ্রণের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই পরিমার্জিত সংস্করণটি কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ, সুন্দর ও লিঙ্গসাম্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি ব্যবহার করে সবার জন্য জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং কিশোর-কিশোরীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ (এনসিটিবি)-র পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

(প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা)

বাণী

প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অ.দা.) ও
প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.)
জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প-পর্যায় ২
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

জেনারেশন ব্রেকথ্রু শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার। বয়ঃসন্ধিকালীন যেসব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন নিয়ে কিশোর-কিশোরীরা সংকটে পড়ে যায়, তা থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনা দেয় এই প্রকল্পের কার্যক্রম। জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ নাগরিক হিসেবে বিকশিত হবার পথ সুগম করে তুলতে সাহায্য করে।

জেনারেশন বেকথ্রু প্রকল্প ২য় পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটি জেলার ২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অর্থায়ন করছে কানাডা সরকার এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)। মাঠপর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট (সিডব্লিউএফডি)। এ প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জেমস শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার শুধু জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পেই সীমাবদ্ধ নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে আরো যেসব প্রকল্প কাজ করছে, সেরকম বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অর্জন আমাদের জন্য গৌরবের।

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পটির ওপর ২০১৮ সালে একটি মিডলাইন স্টাডি করা হয়েছিল। এই স্টাডিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পে ব্যবহৃত জেমস ম্যানুয়ালের কিছু তথ্য পরিমার্জনের সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ ম্যানুয়ালের বেশ কিছু মডিউলে পরিমার্জিত ও আপডেট তথ্য সংযোজন করেছেন। এছাড়াও দ্বিতীয় বছরের মডিউলে মাদকাসক্তি ও এইচআইভি/এইডস বিষয়টি নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে, যা এই ম্যানুয়ালটিকে আরও সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করেছে।

'জেমস শিক্ষক সহায়িকা (সবার জন্য জেন্ডার সমতা)' ম্যানুয়ালের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সময়োপযোগী নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নে আরো সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে, ম্যানুয়ালের পরিমার্জন এবং নতুন তথ্য সংযোজনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের অবদান ও শ্রম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রিয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রণীত এই ম্যানুয়াল তাদের উপকারে সফলভাবে ব্যবহার করতে পারলে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম সার্থক হবে।

(প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য)

Message from UNFPA Representative

Revised Gender Equity Movement in Schools (GEMS) Module

Gender inequality and gender based discrimination not only affects girls and women but also the overall development of a country. It also hinders the right of every young person, especially girls, to fulfil her or his potential without fear and discrimination. In Bangladesh, girls and young women are not given the same value as boys and men and are often discriminated against in various spheres of their lives. The UNFPA supported Generation Breakthrough project, implemented by the Ministry of Education, in collaboration with the Ministry of Women and Children Affairs and Plan International Bangladesh, aims to address gender inequality and gender based discrimination among young adolescents by equipping them with critical thinking skills to question this unequal status quo and aim towards greater gender equality.

The "Gender Equity Movement in Schools" (GEMS) manual, a key component of the Generation Breakthrough project, is aimed at creating gender equitable attitudes, increasing knowledge on puberty and developing life skills among adolescents aged 12-14 years. This manual, developed by the International Centre for Research on Women (ICRW) in India, was adapted to the Bangladeshi context following extensive consultations with various stakeholders at national and district level and approved by the National Textbook and Curriculum Board (NCTB) for use among students of classes VI-X. Four years later, in this revised version, the content of the manual has been made more relevant to present times and, most importantly, included fundamental information on sexual and reproductive health and rights (SRHR) so that adolescents have easy access to accurate and age appropriate information through their schools.

Given the comprehensive and extensive process that was followed to ensure the quality and cultural relevance of this manual, in its original adaptation and in this revision, I am confident that it will provide adolescent boys and girls, with an opportunity to discuss and critically reflect on issues related to inequitable gender norms and violence. I am hopeful the content in this manual will be used to mainstream gender and SRHR information into the education curriculum in future. As we know, investing in quality education for young people is imperative for any country. In the context of Bangladesh, where approximately 30% of the population consist of young people, these investments can yield far-reaching benefits for the nation by effectively transforming the "demographic window of opportunity" into a "demographic dividend".

I wish to thank Plan International Bangladesh, the NCTB and the Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE) of the Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh for their contribution in revising this manual. This project would not have been possible without the generous financial support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, to whom I extend UNFPA's sincere gratitude.

(Asa Torkelsson)

Preface

Orla Murphy
Country Director
Plan International Bangladesh

Adolescents and young people have the right to make their own free and informed choices and to have control over their sexual and reproductive health and lives, free from coercion, violence, discrimination and abuse. Girls and young women in particular are denied the ability to exercise these rights. Fulfilling the rights of all adolescents and young people is fundamental to achieving gender equality.

With a population of 158.9 million, Bangladesh is the eighth most populated country in the world. With 47% of the population below the age of 18, and 47.6 million or 30 percent of the total population are young (10-24 years).

During the past fifteen years, Bangladesh has made good progress in several key development indicators. Net primary enrolment for both girls and boys has increased to 97%, under 5 mortality rates cut by over 60%, life expectancy increased by over 10 years, income levels in terms of per capita GNI tripled from $370 in 2002 to $1465 in 2016 . Against this positive backdrop, there remains a significant gap in girls and boy's knowledge and understanding on their own sexuality, physical well-being, health and bodies. Whatever knowledge they have is frequently incomplete and confused. Low rates of educational attainment, limited sexuality education activities, and inhibited attitudes toward sex contribute to this. Of the services that do exist, there is limited recognition of the different needs of young women and men.

The 'Generation Breakthrough' project started in 2012, as a response to this gap. The Generation Project was a five years-long project. Under the project, 330 Secondary School and 50 Madrasha, in Dhaka, Barisal and Patuakhali were targeted. The purpose of the project was to provide informed guidance to adolescents about human sexuality includes many different forms of behaviour and expression, this supporting their journey to adulthood.

I would like to thank the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), Directorate Secondary and Higher Education (DSHE) of Ministry of Education, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, UNFPA and Plan International Bangladesh for their valuable inputs in enhancing the quality of this manual. This project would not have been possible without support from the Kingdom of Netherlands, UNFPA, European Union and Austrian Development Cooperation to whom I extend my sincere gratitude.

(Orla Murphy)

সূচনা

জেন্ডার বৈষম্য আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি দুষ্ট ক্ষত; নেতিবাচক সামাজিক উপসর্গ। জেন্ডার বৈষম্য আমাদের সমাজের পুরুষতন্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এজন্য তরুণ সমাজের যে আচার বা মূল্যবোধ তা পরিবর্তনে এবং স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভালো থাকার জন্য জেন্ডার বৈষম্যকে মোকাবিলা করা দরকার। ছেলে ও মেয়েদের সামাজিকীকরণ অল্প বয়স থেকেই শুরু হয়। যার ফলে অল্প বয়সেই তাদের মধ্যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার যা তাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে ইতিবাচক গঠন দেবে এবং বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে ভিত্তি তৈরি করবে।

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের চিন্তাধারা এবং জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণাকে প্রভাবিত করা যায়। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের অধিকারভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে; যার শেকড় জেন্ডার সাম্যের মধ্যে নিহিত।

শিক্ষায় জেন্ডার বলতে কী বুঝায়?

জেন্ডার সচেতনতার মাধ্যমেই জেন্ডার শিক্ষা শুরু হয়। এর অর্থ হচ্ছে গতানুগতিক জেন্ডার মূল্যবোধের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর ফলে যে বৈষম্যের উদ্ভব হয় তা চিহ্নিত ও মোকাবিলা করা। জেন্ডার শিক্ষা জেন্ডার স্টেরিওটাইপ কমানোর মাধ্যমে সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য তৈরিতে সহায়তা করে। এর ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক তৈরি হয়। শুধু ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কারণে কাউকে কম বা বেশি মূল্যায়ন করা হয় না।

জেন্ডার শিক্ষার ফলে কন্যা শিশুরা আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীন হয় এবং তারা যা বলতে বা করতে চায় তাতে সমর্থ হয়। এতে তাদের জনসম্পৃক্ততাও বৃদ্ধি পায়।

জেন্ডার শিক্ষার ফলে ছেলেদের আগ্রাসী মনোভাব দূর হয় বা কমে যায়, আরো সামাজিক হয় এবং আরো জনসম্পৃক্ত হয়।

জেন্ডার শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সত্য ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং এতে তারা প্রত্যেক মানুষই যে স্বতন্ত্র ও আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তা বুঝতে পারে। সবাইকে একই পাল্লায় মাপা এবং জেন্ডার প্রত্যাশা যে তাদের উন্নতি ও পূর্ণ বিকাশে বাধা তাও বুঝতে সাহায্য করে।

জেন্ডার শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কেবল কিছু শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনে শিক্ষকদের ভূমিকা অতুলনীয়। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ এবং তাদের লক্ষ্য ও স্বপ্ন দর্শনে নির্দেশক হতে পারেন। তাঁরা স্কুলে জেন্ডার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

স্কুলকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার পদক্ষেপ হিসেবে ভারতের কমিটি অফ রিসোর্স অর্গানাইজেশনস ফর লিটারেসি এবং টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন ওমেন 'জেন্ডার ইক্যুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস' (GEMS) নামে একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে যা স্কুল ও মাদ্রাসার ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প

জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় ইতিবাচক আচরণ মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের সাথে জেন্ডার সাম্যের একটি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে। এ প্রকল্পে কিশোর-কিশোরীদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের দক্ষতা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। উপযুক্ত ও কার্যকর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য, সচেতনতা, দক্ষতা এবং কৈশোরবান্ধব সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই প্রকল্প জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত, মাতৃমৃত্যু এবং এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌনরোগ বিস্তার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের আর্থিক সহায়তায় ইউএনএফপি-এর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের প্রথম পর্যায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীরা এই প্রকল্পের উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ঢাকা থেকে মোট ৩৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং ১৫০টি ক্লাবের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের সফলতার ধারাবাহিকতায় আরো পাঁচটি জেলা সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটি জেলার ২৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ প্রকল্পের অর্থায়ন করছে কানাডা সরকার। ইউএনএফপিএ-র কারিগরি সহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট (সিডব্লিউএফডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

কিশোর-কিশোরীরা যেন ভবিষ্যতে দায়িত্ববান, অহিংস, সুস্থ ও সুখী জীবনধারণ করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান তাদের এই প্রকল্প থেকে দেয়া হয়। ভবিষ্যতে যেন তারা এমন একজন সঙ্গী, মা, বাবা বা অভিভাবক হতে পারে যাদের মধ্যে থাকবে জেন্ডার সমতার মনোভাব।

কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং জেন্ডার সাম্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্পের আওতায় 'জেমস শিক্ষক সহায়িকা (সবার জন্য জেন্ডার সমতা)' ও শিক্ষার্থীদের জন্য 'আমার জেমস ডায়েরি' প্রণীত হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ন্যাশনাল কারিকুলাম এন্ড টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), ইউএনএফপিএ এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর বিশেষজ্ঞ দল ভারতের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন উইমেন প্রণীত জেমস প্যাকেজের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'জেমস' প্যাকেজ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে প্রথম পর্যায়ের 'জেমস' বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও প্রকল্পের উপর পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা ফলাফলের আলোকে এটি পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের জন্য মাউশি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ইউএনএফপিএ-এর কারিগরি সহায়তায় এনসিটিবি, মাউশি ও প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক 'জেমস শিক্ষক সহায়িকা' ও 'আমার জেমস ডায়েরি' পরিমার্জন করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং জেন্ডার সাম্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হবে।

এই শিক্ষক সহায়িকা প্রসঙ্গে

এই শিক্ষক সহায়িকাটি শিক্ষার্থীদের সাথে দলগত শিক্ষা কার্যক্রম (গ্রুপ এডুকেশন অ্যাক্টিভিটি/জি.ই.এ) অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রচিত। এটি ৯টি মডিউলের সমন্বয়ে সজ্জিত যার প্রত্যেকটির সুনির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় রয়েছে। প্রথম চারটি মডিউল প্রথম বর্ষ এবং বাকি পাঁচটি মডিউল দ্বিতীয় বর্ষ পরিচালনা করা হবে।

প্রথম বর্ষ

মডিউল ১ - জেন্ডার
মডিউল ২ - বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য
মডিউল ৩ - আবেগ
মডিউল ৪ - সহিংসতা

দ্বিতীয় বর্ষ

মডিউল ১ - জেন্ডার
মডিউল ২ - মাদকাসক্তি ও এইচআইভি/এইডস
মডিউল ৩ - সম্পর্ক
মডিউল ৪ - বাল্যবিবাহ ও এর প্রতিরোধ
মডিউল ৫ - দৃঢ় প্রত্যয়ী যোগাযোগ

প্রত্যেক মডিউলের ৩টি পর্ব আছে:

পর্ব-ক: সমন্বয়ের সুযোগ

এই পর্বে আলোচ্য বিষয় কীভাবে স্কুল/মাদ্রাসায় শেখানো হয় এমন বিভিন্ন বিষয়ের সাথে কীভাবে সমন্বিত করা যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পর্ব-খ: শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যক্রম

এই পর্বে যে সকল কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি পরিচালনা করা প্রয়োজন তা উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েকটি মডিউলের সাথে অতিরিক্ত রিসোর্স উপকরণও দেয়া আছে।

শিক্ষার্থীদের সকল কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম/সেশন ঠিক করা হয়েছে; যা তাদের প্রশ্ন, মতামত ও ধারণা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করবে। এই শিক্ষক সহায়িকার সাথে একটি 'জেমস ডায়েরি' রয়েছে। কার্যকরভাবে সেশন পরিচালনার জন্য এগুলো ভালো ভাবে জেনে নেয়া ও বোঝা দরকার। এই শিক্ষক সহায়িকাটি ১২-১৪ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে জেন্ডার বিষয়ক আলোচনা করার জন্য শিক্ষক বা বাইরের সহায়ক ব্যবহার করতে পারেন।

পর্ব-গ: সহায়কের জন্য

এই পর্বে সহায়কের জন্য তথ্য ও রেফারেন্স সংবলিত নির্দেশনা রয়েছে যা সেশন পরিচালনার সময় সহায়তা করবে।

কে সহায়ক হবেন? নারী বা পুরুষ

শিক্ষার্থীদের সাথে দলগত কাজ কার পরিচালনা করা উচিত? এটা কি আলাদাভাবে হওয়া উচিত? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর। কিছু বিষয় যেমন শরীর এবং শারীরিক পরিবর্তনের বিষয় আলোচনার জন্য সহায়ক একই লিঙ্গের হওয়াই ভালো। এতে অংশগ্রহণকারীরা নিঃসংকোচে খোলামেলা আলোচনা করতে উৎসাহ বোধ করে। আপনি যদি মনে করেন অংশগ্রহণকারীরা একসাথে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না; তাহলে প্রথম দিকে আলাদাভাবে সেশন পরিচালনা করুন, ধীরে ধীরে একত্রে আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এ কারণে জেমস সেশন প্রথম বছরে আলাদাভাবে এবং দ্বিতীয় বছরে মিশ্র দলে পরিচালনা করা হয়েছিল।

আপনি কীভাবে একজন সফল সহায়ক হতে পারেন?

কার্যকর সহায়তার জন্য জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। কারণ কোনো একটি দলের কথা শোনা, বোঝা ও তাদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা সহজ কাজ নয়। এটা শুধু সেশন পরিচালনার জন্যই নয়, যেকোনো বিষয় শেখানোর জন্যও প্রযোজ্য। জেন্ডার সব বিষয়ের জন্যই প্রযোজ্য। তাই শুধু এ বিষয়ে আলোচনার সময়ই এটার উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে তা নয়, বরং সকল ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব রয়েছে। জেন্ডার বিষয়ক ধারণার প্রতিফলনের জন্য বিশেষ আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এজন্য এখানে শিক্ষার্থীদের সাথে জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে সেশনগুলো পরিচালনার উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে তাদের প্রত্যেক কাজে এটি সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত উপায়ে তা করা যেতে পারে:

শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য সম্পর্কে উপলব্ধি

১. ছেলে-মেয়ে উভয়ের শেখার ক্ষমতাকে মূল্য দিন।

২. ছেলে-মেয়ে উভয়ের চারপাশ অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার শেখার ক্ষমতা ও অগ্রগতিতে সমানভাবে সহায়তা করুন এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে অবদান রাখার চেষ্টা করুন।

শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আচরণ

৩. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বন্ধুত্বহীন ও জেন্ডার পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতি সতর্কতার সাথে দৃঢ়ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন।

৪. ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের আচরণ না ঘটে সেজন্য এগুলোকে বর্জন করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

৫. ছেলে ও মেয়ে উভয়কে তাদের মতামত ও কাজ উপস্থাপনের জন্য সমান সুযোগ দিন।

৬. ছেলে ও মেয়ে উভয়কে একই রকম কাজ দিন (যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করার কাজ, আসবাবপত্র সরানো ইত্যাদি)।

৭. ছেলে ও মেয়ে উভয়কে শ্রেণি নেতা হতে সহায়তা ও উৎসাহ দিন, প্রয়োজনে একজনকে নেতা এবং অন্যজনকে উপনেতা করুন।

শিখন পরিবেশ:

৮. নারী ও পুরুষ উভয়কে জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করে এমন উপকরণ ব্যবহার করুন; যদি তা না হয় তবে; শিক্ষার্থীদের এই সনাতনী ধারাকে চ্যালেঞ্জ করার আমন্ত্রণ জানান।

৯. দেয়ালে এমন পোস্টার প্রদর্শন করুন যাতে নারী ও পুরুষের সমান সংখ্যক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় এবং কাজের সমতা প্রকাশ পায়। সর্বোপরি একটি জেন্ডার নিরপেক্ষ বা ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করুন।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি:

এই সহায়িকায় জেন্ডার সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, কাজ ও বিশ্বাস ইত্যাদি সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাই হলো জেন্ডার সম্পর্কিত আলোচনা। এটি শিশুদের তাদের ধারণা বিনিময়, চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ও মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করে, চলমান পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সহায়তা করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে– এখান থেকে শিশুরা প্রশ্ন করার কৌশল, আচার-ব্যবহার এবং নতুন করে জীবন দক্ষতা উন্নয়ন করতে শেখে।

জেন্ডার সম্পর্কে আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে মন খুলে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মতামত ও জ্ঞান বিনিময় করতে পারে তার জন্য একটি নিরাপদ আলোচনাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিকল্প পরামর্শ দেয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই সহায়িকায় ব্যবহার করা হয়েছে এমন কতিপয় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে দেয়া হলো। ইতোমধ্যে এই পদ্ধতিগুলোর সাথে হয়তো আপনারা পরিচিত, তাই শুধু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

ব্রেইনস্টর্মিং বা মস্তিষ্কঝড়: ব্রেইনস্টর্মিং বা মস্তিষ্কঝড় হলো প্রত্যেককে সক্রিয় অংশগ্রহণের কার্যকর পদ্ধতি। এটি আলোচ্য বিষয়ের উপর ধারণার উন্মেষ ঘটানোর জন্য একটি শক্তিশালী পদ্ধতি। ব্রেইনস্টর্মিং-এর সময় কাউকে কোনো উত্তরের জন্য কোনো মানদণ্ডে ফেলা যাবে না। প্রত্যেকটি উত্তর সকলের দেখার জন্য ফ্লিপচার্ট বা বোর্ডে লেখা হয়। এই পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা/মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করে এবং তাদের কোনো বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম করে।

কেস স্টাডি/ঘটনা বিশ্লেষণ বা গল্প: এই পদ্ধতি বাস্তবে ঘটেছে বা ঘটতে পারে এমন কোনো ঘটনা, গল্প বা দৃশ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে। এটা সহজ ও বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। ঘটনা বিশ্লেষণ কৌশলটি বাস্তবতার বিকল্প হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীরা কোনো রকম ব্যর্থতার পরিণাম বা ব্যক্তিগত জটিলতা ছাড়াই বাস্তব জীবনের বাধা বা চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ বা সমাধান করতে পারে। দলে ঘটনা বা গল্প নিয়ে আলোচনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে ও তারা কোনো সমস্যা বা বাধার সম্মুখীন হলে তাদের করণীয় নিয়ে চিন্তা করতে সহায়তা করে। ঘটনা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, সমস্যা বিশ্লেষণ, সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতার জন্য কার্যকর।

গেমস/খেলা: গেমস বা খেলা হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ পরিচালনার মাধ্যম যা শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত রাখে। এভাবে শেখাটা মজা করা হলেও এটি অধিক কার্যকর ও স্থায়ী হয়। আমাদের সমাজে প্রচলিত খেলাধুলাকে আলোচনার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দলগত আলোচনা: দলগত আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর বা জবাব বের করে আনে এবং জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ ও ভ্রান্ত ধারণা শুধরে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়।

দলগত আলোচনার কার্যকারিতা প্রায়ই নির্ভর করে উন্মুক্ত প্রশ্নের উপর। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় না বরং এর চেয়ে বেশি কিছু হয়। 'এই সেশন থেকে তুমি কী শিখেছ?' এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্নের ধরন যা অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা-ভাবনা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়। 'কাজটি তোমাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে?' এটিও একটি উন্মুক্ত প্রশ্নের উদাহরণ। কিন্তু তুমি কি কিছু শিখেছিলে?" প্রশ্নটি উন্মুক্ত প্রশ্ন নয়, কারণ অংশগ্রহণকারীরা সহজেই 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে এর উত্তর দিতে পারে।

ফলপ্রসূ দলীয় আলোচনার আরেকটি কৌশল হলো প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মতামতের স্বীকৃতি দেয়া। শিক্ষার্থীদের যদি জানে যে, তাদের চিন্তা-ভাবনা বা অনুভূতি প্রকাশের কারণে তাদের সমালোচনা করা হবে না বা তাদের কোনো মানদণ্ডে মাপা হবে না তাহলে তারা মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা বা অনুভূতি বিনিময় করতে ইচ্ছুক হয়।

রোল প্লে/ভূমিকাভিনয়: একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে কোনো নতুন দক্ষতা চর্চার জন্য শ্রেণিকক্ষে ভূমিকাভিনয় অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। ভূমিকাভিনয় আবেগপূর্ণ হতে পারে এজন্য অংশগ্রহণকারীদের বোঝাতে হবে যে তারা নিজেদের নয় বরং একটি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলছে। ভূমিকাভিনয় বাস্তব জীবনের ঝুঁকি ছাড়াই বাস্তব অবস্থা বুঝার সুযোগ করে দেয়।

নির্যাতিত বা সহিংসতার শিকার শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান: কিছু শিক্ষার্থীর সহিংসতার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে। তারা বাড়িতে বা স্কুলে সহিংসতা দেখে থাকতে পারে অথবা নিজেরাই সহিংসতার শিকার হতে পারে; যা কখনো কাউকে বলতে পারে না বা স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারে না। কেউ কেউ যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে কিন্তু সেটাকে কখনও যৌন হয়রানি হিসেবে বুঝতে পারে না। আবার কেউ বা বন্ধুদের দ্বারা নির্মম হয়রানি বা হুমকির শিকার হয়। কিন্তু তা কাউকে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কেউ কেউ অন্যের প্রতি হিংসাত্মক বা সহিংস থাকতে পারে এবং এ সম্পর্কে নিজেকে দোষী ভাবতে পারে। আপনি এ ধরনের শিক্ষার্থী নিয়ে কী করবেন? নিম্নে আপনার জন্য কিছু পরামর্শ দেয়া হলো যা আপনার কাজে লাগতে পারে।

অস্বস্তিদায়ক কাজসমূহ

- শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশে বাধাগ্রস্ত করবেন না বা লজ্জা দিবেন না;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্রুপ, উপহাস বা দোষারোপ করবেন না;
- শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ে জেরা করবেন না;
- শিক্ষার্থীদের রায় দিয়ে দিবেন না;
- শিক্ষার্থীদের অনুভূতিকে উপেক্ষা করবেন না;
- শিক্ষার্থীদের অনুভূতি সম্পর্কে আপনার মতামত প্রকাশ করবেন না;
- শিক্ষার্থীদের অনুভূতি অন্যের সাথে প্রকাশ্যে আলোচনা করবেন না;
- কষ্টে থাকা শিক্ষার্থীদের অনতিবিলম্বে সহযোগিতা করুন;
- সহযোগিতা প্রয়োজন, এমন শিক্ষার্থীদের সাথে আলাদাভাবে কথা বলুন;
- শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে কোনো ধারণা পোষণ করে বসবেন না। আপনার ধারণা যাই হোক না কেন, তাদের তথ্য ও সহযোগিতা দিন। শিক্ষার্থীদের কী বলতে চায় তা শুনুন। তাদের সহায়তা ও স্বচ্ছ ধারণা দিন। তাদের আশ্বস্ত করুন যে, মানসিক বিপর্যয় আসতেই পারে এবং তা একসময় দূর হয়ে যাবে।

- শিক্ষার্থীদের সর্বদা ফলো-আপ করুন যা প্রমাণ করে আপনি তাদের ভালো চান ও তাদের খেয়াল রাখেন।
- একজন কাউন্সেলর, শিশু তদারককারী বা এমন কেউ একজন থাকা দরকার যিনি এধরনের শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন।

শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের পূর্বে:

আমরা আশা করি, এই সহায়িকার বিষয়গুলো পড়ে ও পরিচালনা করে আপনি রোমাঞ্চিত হবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে ছেলে-মেয়েরা সত্যিকার অর্থেই এই আলোচনায় যুক্ত হয় ও মজা পায়; যা তাদের চিন্তা-ভাবনা ও কাজে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। আমাদের পরামর্শ হলো:

- কার্যক্রম শুরুর আগে পুরো সহায়িকাটি পড়ে নিন।
- সেশনগুলো জেনে নিন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো আগে থেকেই তৈরি রাখুন।
- নিশ্চিত করুন যে, প্রত্যেকটি কার্যক্রম একটি সুন্দর উপসংহার, গ্রহণযোগ্য ও সুস্পষ্ট বার্তা দিয়ে শেষ হয়েছে।

আশা করি আপনি ও শিক্ষার্থীরা
জেন্ডার সমতার অগ্রযাত্রাকে
উপভোগ করবেন।

বর্ষ-১ (এক)

মডিউল - ১ জেন্ডার ০১-১৭

অধিবেশন ১ - জেন্ডার ও সেক্স

অধিবেশন ২ - জেন্ডার বৈষম্য, সাম্য ও সমতা

অধিবেশন ৩ - শ্রম বিভাজন

মডিউল - ২ বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য ১৮-৩১

অধিবেশন ১ - বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন

অধিবেশন ২ - মাসিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

অধিবেশন ৩ - স্বপ্নদোষ ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

মডিউল - ৩ আবেগ ৩২-৪৮

অধিবেশন ১ - আবেগ অনুধাবন

অধিবেশন ২ - আবেগ ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন ৩ - মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মনোসামাজিক সহায়তা

মডিউল - ৪ সহিংসতা ৪৯-৭১

অধিবেশন ১ - সহিংসতার ধারণা

অধিবেশন ২ - কিশোর-কিশোরীদের প্রতি ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য সহিংসতাসমূহ ও এর প্রভাব

অধিবেশন ৩ - সহিংসতা থেকে উত্তরণ

অধিবেশন ৪ - সহিংসতার প্রতি সম্মিলিত প্রতিবাদ

বর্ষ-১ (এক) মডিউল-১

জেন্ডার

১.ক. উদ্দেশ্য

জেন্ডার ও সেক্স সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে নারী-পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

১.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- জেন্ডার ও সেক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- নারী ও পুরুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- জেন্ডার সমতা, সাম্য ও বৈষম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- নারী ও পুরুষের শ্রমবিভাজনের প্রথাগত ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে;
- নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - জেন্ডার ও সেক্স
- অধিবেশন ২ - জেন্ডার বৈষম্য, সাম্য ও সমতা
- অধিবেশন ৩ - শ্রম বিভাজন

অধিবেশন ১ - জেন্ডার ও সেক্স

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- নারী ও পুরুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

আলোচনা, প্রদর্শন, ভূমিকাভিনয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়

ঘ) উপকরণ:

বোর্ড ও চক, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

ছেলে ও মেয়ের সাথে সম্পর্কিত শব্দসমূহের মুক্ত তালিকা করার সময় শিক্ষার্থীদের পরিচিত ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করুন। অন্যরা কষ্ট পায় বা বিরক্ত হয় এমন কিছু শব্দ বা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তা সামলে নিন। সহায়ক তথ্য ১.১.৫-এর আলোকে তৈরি স্ক্রিপ্ট পূর্বেই তৈরি করে রাখুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।
- বোর্ডের মাঝ বরাবর একটি সরলরেখা এঁকে এটিকে দু'ভাগে ভাগ করুন। এক ভাগের উপরে 'মেয়ে' ও অন্যভাগের উপরের অংশে 'ছেলে' শব্দ দু'টি লিখুন। এবার নিচে দেয়া প্রশ্নগুলোর উপর আলোচনা করুন। বোর্ডে 'মেয়ে' বা 'ছেলে' লেখা অংশে তাদের উত্তরগুলো লিখুন। আলোচনার পটভূমি অনুযায়ী উত্তরগুলো লিখুন।
- শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করুন:
  - 'মেয়ে' শব্দটি শুনলে তোমাদের কী কী বৈশিষ্ট্য বা আচরণের কথা মনে পড়ে?
  - 'ছেলে' শব্দটি শুনলে তোমাদের কী কী বৈশিষ্ট্য বা আচরণের কথা মনে পড়ে?
- ছেলে-মেয়েদের উত্তর শুনে কোনটি ছেলেদের ও কোনটি মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তা বোর্ডে লিখুন (প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য ১.১.২- এর সাহায্য নিন)।

মেয়ে	ছেলে
সুন্দর	সবল

- ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অনেক কিছু সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে এবং বৈসাদৃশ্য বা অমিল রয়েছে। এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোর মধ্যে কোনটি সমাজ সৃষ্ট ও কোনটি শারীরিক, তা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জেন্ডার ও সেক্সের ধারণা স্পষ্ট করুন।

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান মেয়েদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো, এগুলোর মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য একজন ছেলের মধ্যেও থাকতে পারে?
- ছেলেদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা হলো, এগুলোর মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য একজন মেয়ের মধ্যেও থাকতে পারে?
- বলুন, 'জেন্ডারের ধারণাটি সমাজ থেকে সৃষ্টি হয় এবং তা পরিবর্তনযোগ্য' (প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য ১.১.৩ এর সাহায্যে ধারণা স্পষ্ট করুন)।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জানতে চান, তাদের জেন্ডারের ধারণাটি স্বচ্ছ হয়েছে কি না? ছেলে ও মেয়ের এই সামাজিক ভিন্নতা/আচরণ কীভাবে বা কার মাধ্যমে তৈরি হয়? উত্তর শোনার পর সহায়ক তথ্য ১.১.৫ এর আলোকে নারী ও পুরুষের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া তুলে ধরার জন্য একটি ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করে চরিত্র বুঝিয়ে দেন।
- ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন, জন্ম থেকেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আমরা বিভিন্নভাবে পার্থক্যের সূচনা করি। কয়েকজনকে প্রশ্ন করুন সমাজ একজন ছেলে ও একজন মেয়ের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে?
- ছেলে বা মেয়ে হিসেবে এই আচরণ/কাজ এর পার্থক্য তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিবার থেকে। এরপর সমাজ, স্কুল, কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিটি ক্ষেত্রে এই শিখন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সহায়ক তথ্য ১.১.৪ এর আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেন্ডার ও সেক্স এবং নারী ও পুরুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করে প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

সার-সংক্ষেপ

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে শারীরিক ভিন্নতা হলো সেক্স। এটি প্রাকৃতিক এবং অপরিবর্তনীয়। নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট পার্থক্য হলো জেন্ডার। জেন্ডার ধারণা সমাজ দ্বারা নির্ধারিত বলে ইচ্ছে করলেই তা পরিবর্তন করা যায়। একজন মানুষের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে তা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের মধ্যেই থাকতে পারে।

মূল বার্তা

ছেলে ও মেয়ে উভয়ই সমান, সকলেই সব দায়িত্ব পালন করতে পারে। জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন দেশে ও সমাজে বিভিন্ন রকম হয়।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির সাথে পরিচয় করিয়ে দিন এবং ৩-৪ নম্বর পৃষ্ঠা বাড়িতে পূরণ করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন ৫-৬ নম্বর পৃষ্ঠার 'এটা কি সম্ভব? নারীরা কি ক্রিকেট খেলতে ও পুরুষেরা রান্নাবান্না করতে পারে?' এবং ৭-৮ নম্বর পৃষ্ঠার 'ছেলে কী, মেয়ে কী' কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে বলুন। ১৮-১৯ নম্বর পৃষ্ঠার 'আমাকে শাবাশ দাও' অনুচ্ছেদটি এই সেশনের ফলো-আপ কার্যক্রম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অংশটুকুতে ছেলে ও মেয়েরা কীভাবে ঘরের কাজে অংশ নিতে পারে তা দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলুন, পরবর্তী সেশনে ৯-১০ নম্বর পৃষ্ঠা পূরণ করবে এবং ছেলে ও মেয়ের সামাজিক সংজ্ঞা তাদের কীভাবে প্রভাবিত করছে এ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে একে অন্যের সাথে আলোচনা করবে।

সহায়ক তথ্য

১.১.১. জেন্ডার সম্পর্কে ধারণা

ধারণা প্রতিফলনের জন্য প্রশ্ন

- একটি মেয়ের জীবনের লক্ষ্য কী?
- এ ধরনের আচরণ পরবর্তী সময়ে নিশির জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে?

আসলে নিশিকে যে কলেজে পাঠানো হবে না, সেটা তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত নয়। তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হচ্ছে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকা দিয়ে।

সমাজ ব্যবস্থা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারা নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলে দেয়। আর দীর্ঘকাল ধরে নারী-পুরুষ সংক্রান্ত এই ধারণাগুলো আমাদের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে গেছে। এর মধ্যে কিছু ধারণা আছে যা নারী-পুরুষের শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক সহাবস্থানের অন্তরায়, সমাজের ইতিবাচক বিকাশের পরিপন্থী। আর আমরা এসব ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে সত্য বলে মেনে নিয়ে ভুল করে চলেছি। এমনকি এরকম কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমরা দু'বার চিন্তাও করি না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো মাকে তার ছেলে ও মেয়ের জন্য কাজ বণ্টন করতে হলে দেখা যায়, ছেলেটি বাল্ব লাগানো, গৃহস্থালি কেনাকাটা ইত্যাদি কাজ পায়; অথচ মেয়েটি পায় রান্নাবান্না ও ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করার কাজ। অনেক সময় আমরা এটা অনুধাবন করি না যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ছেলে-মেয়েদের জীবনে তাদের পছন্দ-অপছন্দকে সংকুচিত করে দেয়। আর এভাবেই জেন্ডার বৈষম্য চক্রটি চলে আসছে। একজন নারী শিক্ষিত হলে তিনি তার পরিবারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন এবং পরিবারের চাহিদা মিটাতেও সক্ষম হন।

১.১.২ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ের বৈশিষ্ট্য:

মেয়ে	ছেলে
সুন্দর	সবল
আবেগপ্রবণ	সাহসী
স্ফীত স্তন	কণ্ঠস্বর পরিবর্তন
নিতম্ব ভারী	দাড়ি, গোঁফ গজায়
দয়ালু	কঠোর
গর্ভধারণ করতে পারে	গর্ভধারণ করতে পারে না
মাসিক হয়	বীর্যপাত হয়

১.১.৩. জেন্ডার ও সেক্সের ধারণা

সেক্স ও জেন্ডার এক জিনিস নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতে 'সেক্স' হলো নারী-পুরুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্য। 'জেন্ডার' হলো নারী-পুরুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের আচার-আচরণ, কাজ বা ভূমিকা সমাজই নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং সেক্স হলো জন্মগতভাবে সৃষ্ট, অপরিবর্তনীয় ও সার্বজনীন। আর জেন্ডার সমাজভেদে পরিবর্তনশীল।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি সৃষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Sex) সাধারণত নিম্নরূপ:

নারীর সন্তান জন্মদান ও মাতৃদুগ্ধদানের জন্য দেহের বাইরে ও ভেতরে বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যা পুরুষের চেয়ে আলাদা। পুরুষের সন্তান জন্মদানের জন্য দেহের ভেতরে ও বাইরে বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যা নারীর মতো নয়। নারীর কণ্ঠস্বর সাধারণত চিকন হয়। পুরুষের কণ্ঠস্বর সাধারণত মোটা। নারীর দাড়ি-গোঁফ হয় না ও দেহে সাধারণত লোম কম থাকে। পুরুষের দাড়ি গোঁফ হয় ও দেহে লোম বেশি হয়। নারীর মাংসপেশি কম বিকশিত এবং দেহকাঠামো পুরুষের চেয়ে কিছুটা ছোট। পুরুষের মাংসপেশি সবল ও নারীর চেয়ে দেহকাঠামো কিছুটা বড়।

সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট নারী ও পুরুষের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য বা ভিন্নতা (Gender) সাধারণত নিম্নরূপ:

নারী দুর্বল, লাজুক, কোমল, ভীরু, মমতাময়ী। পুরুষ সবল, সাহসী। নারী সন্তান লালন-পালন-কারী। পুরুষ সংসারের কর্তা বা প্রধান। নারী ঘরের মধ্যে থাকবে, বাইরে বের হবে না। পুরুষ রাজনীতি ও বাইরের সব কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে। নারী ঘর-সংসারের সকল কাজ বা সমস্ত গৃহস্থালি কাজ করে। পুরুষ উপার্জন করে। নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশি। পুরুষ যুক্তিবাদী, আবেগ কম। নারী কান্নাকাটি করে। পুরুষ কান্নাকাটি করে না বা কম করে। নারীর বুদ্ধি, মেধা কম; গণিতে কম ভালো হয়। পুরুষের বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা বেশি; গণিতে ভালো হয়। নারীর বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। পুরুষ বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে। স্বামীর চাইতে স্ত্রী বয়সে ছোট হয়। নারী রূপচর্চা করে, গয়না পছন্দ করে ও লম্বা চুল রাখে। পুরুষ ছোট চুল রাখে।

১.১.৪ সামাজিকীকরণ:

জন্মের পর থেকে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছেলে ও মেয়েকে বড় করে তোলা হয়, সেই প্রক্রিয়াটি হলো সামাজিকীকরণ। শিশু জন্মের পর কাদামাটির মত নরম থাকে। পরিবার, সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব) তাকে শেখায় কী করা যাবে আর কী করা যাবে না। সমাজ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রচলিত রয়েছে। যেমন পুরুষের তুলনায় নারীকে নমনীয়, ধৈর্যশীল, স্নেহময়, আবেগপ্রবণ হিসেবে ভাবা হয়। আবার নারীর তুলনায় পুরুষকে কঠিন, অসহিষ্ণু, আবেগহীন, কর্তৃত্বপরায়ণ, স্বেচ্ছাচারী হিসেবে ভাবা হয়।

১.১.৫ স্ক্রিপ্ট ১: ভূমিকাভিনয়

- চরিত্র: মা, মেয়ে, ছেলে।

- মেয়ে: হা হা হা (অট্টহাসি)।

- মা: চুপ কর (ধমক দিয়ে)। এত জোরে হাসছিস কেন? মেয়েদের এত জোরে হাসতে নেই।

- ছেলে: কাঁদতে কাঁদতে ঢুকলো।

- ছেলে: হুউম-হুউম (কান্না)

- মা: কিরে বাবা, কাঁদছিস কেন? ছেলেদের কাঁদতে নেই, ছেলেদের কান্না মানায় না।

শিক্ষক: দেখলে তো কীভাবে শৈশব থেকেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আমরা বিভিন্নভাবে পার্থক্য সূচনা করি।

অধিবেশন ২ - জেন্ডার বৈষম্য, সাম্য ও সমতা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- জেন্ডার বৈষম্য, সাম্য ও সমতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

আলোচনা, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

ঘ) উপকরণ:

বোর্ড ও চক, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

পূর্বে প্রস্তুতকৃত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করুন। শিক্ষার্থীদের পরিচিত ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করুন। ভূমিকাভিনয়ের স্ক্রিপ্ট পূর্বেই তৈরি করে রাখুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জেন্ডার ও সেক্স সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করুন।
- শিক্ষার্থীদের ২জন করে জোড় বেঁধে দিন। মোট ১০টি জোড়াকে নিচের আচরণ করে দেখাতে বলুন। প্রতিটি আচরণই জোড়ার একজন ছেলেটির দেখাবে ও আরেকজন মেয়েটির দেখাবে। যেমন: মেয়েদের মতো হাঁটা এবং ছেলেদের মতো হাঁটা।

  হাঁটা/কান্না/হাসি/দৌড়/ঝগড়া

- এবার বলুন, ছেলে ও মেয়ের এই ধরনের আচরণ কীভাবে বা কার মাধ্যমে তৈরি হয়? জন্ম থেকেই ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আমরা বিভিন্নভাবে পার্থক্যের ও প্রত্যাশার সূচনা করি। প্রশ্ন করুন সমাজ একজন ছেলে ও মেয়ের কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে যার ফলে তাদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হয় এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বৈষম্য চলতেই থাকে।
- সহায়ক তথ্য ১.২.১ এর আলোকে পূর্বে প্রস্তুতকৃত পোস্টার পেপার উপস্থাপন করুন (যেখানে জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ কীভাবে বৈষম্যের শিকার হয় তা তুলে ধরা হয়েছে)।
- এর আগের অধিবেশনগুলোয় আমরা ছেলে-মেয়ের বৈষম্যগুলো কী কী তা বের করেছি। এবার আমরা আলোচনা করবো এই জেন্ডার বৈষম্যগুলো দূর করে কীভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।
- এবার শিক্ষার্থীদের সহায়ক তথ্য ১.২.২ এর তিনটি ছবি দেখান এবং ওই ছবি অনুযায়ী কী করলে তিনজনেই খেলা দেখতে পাবে তা জিজ্ঞেস করুন।
- সবার উত্তর নিয়ে ছবিটি ব্যাখ্যা করুন যে, আমরা যদি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে যে বেড়াটি সমস্যা তৈরি করছে সেটি পরিবর্তন করতে হবে। সহায়ক তথ্য ১.২.৩ ও ১.২.৪ এর সাহায্যে জেন্ডার সমতা ও সাম্য ধারণা দু'টি স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা, সাম্য এবং সহায়ক তথ্য ১.২.৫ এর সাহায্যে পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করে প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

সার-সংক্ষেপ:

জেন্ডার সমতা হলো নারী-পুরুষের সমমর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা আর নারী-পুরুষের প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকার ও কর্তব্যের সুষম বণ্টনই সাম্য। নারী-পুরুষকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে এবং ভিন্ন আচরণ করলে জেন্ডার বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

মূল বার্তা

সমাজে নারী-পুরুষে বৈষম্য থাকলে সমতা ও সাম্য অর্জিত হয় না।

সহায়ক তথ্য

১.২.১ জেন্ডার বৈষম্য (gender discrimination) কী?

জেন্ডার বৈষম্য হলো ছেলে-মেয়েকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা ও সেভাবে আচরণ করা। এই বৈষম্যের ফলে ছেলেদের সবসময় সবল হয়ে থাকতে হয় ও মেয়েদের দুর্বল মনে করা হয়। ছেলে ও মেয়ে শিশু জন্মানোর পর বিভিন্ন নিয়ম-নীতি আরোপ করা হয়; যার ফলে ছেলেরা-পুরুষেরা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় ও সামনের দিকে এগিয়ে যায় ও মেয়েরা-নারীরা ধীরে ধীরে পিছনে পড়ে যায় - উন্নয়নের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ধারা চলতেই থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ে উভয়ই বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

জন্মের পর পরই

- জন্মের পর পরই নবজাতক ছেলে শিশুকে আড়ম্বরের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। যেমন: আযান অথবা উলুধ্বনি শোনানো। অন্যদিকে মেয়ে শিশুর মূল্য আমাদের সমাজে কম থাকায় বেশিরভাগ পরিবারে মেয়ে শিশু জন্মের পর খুশি হয় না বা অনাড়ম্বরের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়।
- খাদ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলে শিশু ভালো বা পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণে বেশি পাচ্ছে।

শৈশব কালে

- ছেলে ও মেয়ে শিশুর খেলার উপকরণ এবং সরঞ্জামও আলাদা। যেমন: মেয়েদের হাতে তুলে দেয়া হয় হাঁড়ি-পাতিল আর পুতুল যাতে খেলার ছলে পরবর্তী জীবনে সে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে ছেলেদের জন্য রয়েছে গাড়ি, বল ইত্যাদি যা তাকে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন, কর্মঠ ও শক্তিশালী হতে শেখায়।

কৈশোর কালে

- বারো-তেরো বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মেয়েদের বাইরে খেলাধুলা করা প্রায় কমে যায় ও বাড়িতে গৃহস্থালি কাজে বেশি সময় ব্যয় করে। ফলে মেয়েরা গৃহস্থালি কাজগুলো সামলাতে পারদর্শী হয়ে ওঠে অথচ সে সময় ছেলেরা সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয় বা ভ্রমণ করে এবং পারিবারিক কাজ করা বা দায়িত্ব পালন করা শেখা থেকে বঞ্চিত হয়।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতেও রয়েছে পার্থক্য; যেমন: ছেলেদের জন্য রয়েছে সাধারণত কৃষিশিক্ষা আর মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান যা তাকে রান্নাবান্না, সেলাই, গৃহসজ্জা, সেবাযত্ন অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে পারদর্শী হওয়ার মন্ত্র শেখায়। এটা প্রচলিত বা সনাতনী (স্টেরিওটাইপ) জেন্ডার পার্থক্যকে পুনঃপ্রয়োগ করে থাকে।

- এই সময় ছেলেদের ওপর একটা চাপ থাকে তথাকথিত পুরুষালি আচরণ করার জন্য। তারা নিজেদের বন্ধুদের ও মেয়েদের মাঝে শক্তিশালী, নেতা, রোমান্টিক/প্রেমিক, খেলোয়াড়, রাগী, কর্তৃত্ব/নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। যদি তারা এরকম আচরণ করতে না পারে তাহলে তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়।

• কৈশোরকাল থেকে মেয়ের ও ছেলের বিচরণক্ষেত্র, খেলাধুলা, শিক্ষাচর্চা, মেলামেশা সবকিছুই ভিন্নভিন্নভাবে অগ্রসর হয়। 'মেয়েলি কথা', 'মেয়েলি হাঁটা', 'মেয়েলি খেলা', 'মেয়েলি গল্প', 'মেয়েলি কাজ', 'মেয়েলি আচরণ' ইত্যাদি কাজ বা আচরণগুলো সমাজে মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা হয়। একই সাথে ছেলেদের পুরুষালি আচরণ করতে বলা হয়, এর ফলে ছেলেরা যেমন কিছু দক্ষতা– 'ক্রোধ/রাগ ব্যবস্থাপনা, সমবেদনা ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারে না, তেমনি মেয়েরাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাইরের জগতের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন তা অর্জন করতে পারে না।

প্রজনন কালে

• এই সময়ে পুরুষদের সংসারের কর্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, উপার্জনকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমাজ নারী ও মেয়েদের আবেগপ্রবণ ও পুরুষ ও ছেলেদের কর্তৃত্বকে সম্মান করতে শেখায়। অন্যদিকে, পুরুষ ও ছেলেরা সব আবেগ লুকিয়ে রাখবে এবং নারী ও মেয়েদের কর্তৃত্বের উপর প্রশ্ন করতে পারবে। ফলে, পুরুষদের উপার্জনের চিন্তা থাকে, বিষণ্নতায় ভোগে, তাদের সমস্যার কথা কারো কাছে বলতে পারে না, টেনশনে থাকে, চাপ বেশি থাকে, মানসিক অশান্তি হয়, অনেকসময় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে ভয় পায়।

• অন্যদিকে নারীরাও আয়মূলক কাজের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনীতিতে অবদান রাখে; কিন্তু সেটির কোনো স্বীকৃতি পায় না। এমনকি নারীরা সংসারের সকল দায়িত্ব পালন করলেও সেটার কোনো মূল্য ও স্বীকৃতি নেই। অনেক নারী সংসারের সব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আয়মূলক কাজের সাথে জড়িত যা তাদের উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সহযোগিতা না পাওয়ায় চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে না।

• নারীরা অনেক সময় চাকরির ক্ষেত্রেও সুযোগ ও মজুরি পুরুষদের তুলনায় কম পায়।

বৃদ্ধ বা প্রবীণ বয়সে

• বৃদ্ধ বয়সে নারী ও পুরুষ উভয়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণত পুরুষেরা সম্পত্তির মালিক হওয়ায় পরিবারের অন্য সদস্যরা বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করে বৃদ্ধ নারীদের তুলনায়।

১.২.২

সমতা	সাম্য	ন্যায্যতা
সমতার ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেকে সমান সহযোগিতা থেকে লাভবান হয়।	এখানে প্রত্যেকে চাহিদা অনুযায়ী সহযোগিতা পেয়ে থাকে। যা থেকে ভারসাম্য তৈরি হয়।	ন্যায্যতার ধারণা অনুযায়ী অসমতার মূল কারণ সমাধান করা হয় এবং কাঠামোগত বাধাগুলো দূর করা হয়।

১.২.৩ জেন্ডার সমতা (Gender Equality) কী?

জেন্ডার সমতা বলতে বোঝায় সমাজের নারী-পুরুষের সমমর্যাদা ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার, সমভূমিকা ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জেন্ডার সমতা আনার জন্য নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকে যেন সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সমসুযোগ, অধিকার ভোগ করতে পারে, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে– এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

আপনি কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ৩টি উদাহরণ দিতে পারেন। যেখানে সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে মেয়েদের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়?

১.২.৪ জেন্ডার সাম্য (Gender Equity) কী?

জেন্ডার সাম্য বলতে বুঝায় নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগ ও দায়িত্বের সমান ও সুষম বণ্টন। এই ধারণাটি নারী ও পুরুষের ভিন্ন চাহিদা ও ক্ষমতাকে মেনে নেয় এবং এগুলোকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যা নারী-পুরুষের ভারসাম্যহীনতাকে ঠিক করে দেয়।

- জেন্ডার সমতা আনয়নের একটি পদ্ধতি/উপায় হলো জেন্ডার সাম্য– যার মাধ্যমে প্রত্যেকে সমান মর্যাদা পাবে, সমতার ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠবে ও নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত হবে।
- জেন্ডার সাম্যের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষ সকলের জন্য ন্যায্যতা নিশ্চিত হবে, এর মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান সুযোগ পায়, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং সুফল ভোগের সুযোগ নিশ্চিত হবে। আমরা যদি ন্যায্যতা আনতে চাই তাহলে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-নীতিমালায় সমতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

যখন সম্পদ বা টাকা-পয়সার ঘাটতি দেখা দেয় (এক্ষেত্রে মোহিত সাহেবের বেতন) তখন ছেলে শিশুটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তোমরা কি কখনো এরকম বৈষম্য দেখেছো?

কেন মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে? এটা কীভাবে তাকে, তার পরিবারকে এবং বৃহত্তর পরিসরে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে?

১.২.৫ পিতৃতন্ত্র

পিতৃতন্ত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষেরা প্রাথমিক ক্ষমতা ধারণ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক সুবিধা ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করে। পরিবারের ক্ষেত্রে পিতা ও পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তি পরিবারের অন্যান্য সদস্য বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে। বেশিরভাগ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তি ও পদবি পুরুষের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাহিত হয়।

সাধারণভাবে পুরুষের আধিপত্য ও নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার সম্পর্ক বোঝাতেই পিতৃতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শত শত বছর ধরে পিতৃতন্ত্র সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার কারণে তা মেয়ে ও নারীদের নানান প্রক্রিয়ায় অধীন করে রাখে। পুরুষের এই কর্তৃত্ব অনেক সময় নারীর প্রতি বিভিন্ন রকম সহিংসতারও কারণ। তবে পিতৃতন্ত্র যে শুধু নারীর স্বাধীনতার অন্তরায় তা নয়, এটি অনেক সময় পুরুষের জন্যও ক্ষতিকর। যেমন– রান্না করা, নিজের কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা বা সন্তান লালনের মতো কাজগুলো নারীর কাজ হিসেবে গণ্য হওয়ায় এবং এর কোনো আর্থিক মূল্যায়ন না থাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষেরা এই কাজগুলো শেখে না, বরং নারীর ওপর নির্ভরশীল থাকে, যা তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে বাধা দেয়।

অধিবেশন ৩ - শ্রম বিভাজন

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- নারী ও পুরুষের শ্রমবিভাজনের প্রথাগত ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে;
- নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উদ্বুদ্ধ হবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

আলোচনা, প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময়

ঘ) উপকরণ:

বোর্ড, চক, চার্ট পেপার ও মার্কার, পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

শিক্ষার্থীরা বোঝে এমন ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করুন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হোন। তারা যাতে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল রাখুন। আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহায়ক তথ্য, যা এই অধিবেশনের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে নিচে দেওয়া ছকটি আঁকুন এবং শিক্ষার্থীদের ছকটি পূরণ করতে বলুন (একক কাজ)।

কাজের নাম	সাধারণত কে করে
রান্না করা	
উপার্জন করা	
গাড়ি চালানো	
ঘর মোছা	
কাপড় ইস্ত্রি	
শিশুর যত্ন	
বাজার করা	

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন:

- কেন এমন হয় যে গৃহস্থালি কাজগুলো নারীরাই করে? আবার সেই একই কাজ পুরুষেরা বাইরে কেন করে?

- সাধারণভাবে ছেলেদের কাজগুলো কি মেয়েরা করতে পারে? কোনগুলো করতে পারে? কোনগুলো পারে না? কেন?

- সাধারণভাবে মেয়েদের কাজগুলো কি ছেলেরা করতে পারে? কোনগুলো করতে পারে? কোনগুলো পারে না? কেন?

- কয়েকজনের উত্তর শুনুন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলুন 'তাহলে দেখলে তো তোমাদের পরিবারে কে কী করে তা অনেক ক্ষেত্রে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত"। সহায়ক তথ্য ১.৩.১ ও ১.৩.২ এর আলোকে স্পষ্ট করুন।

দলগত কাজ:

৬টি দল গঠন করুন। সমাজে কাজগুলো কীভাবে করলে কারো উপর বোঝা হবে না - এই বিষয়ে প্রত্যেক দলকে তিনটি করে পয়েন্ট পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। দলগত কাজ উপস্থাপনের পর সহায়ক তথ্য ১.৩.৩ এর সাহায্যে শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের বলুন- সবাই সমান, সবার কাজের প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন।

ছ) মূল্যায়ন:

দলগত কাজ থেকে শ্রম বিভাজনের ধরন ও এক্ষেত্রে করণীয় কী তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত করুন।

সার-সংক্ষেপ:

নারী-পুরুষের দক্ষতা উন্নয়ন ও বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং এর পাশাপাশি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের বাড়ির কাজ ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

মূল বার্তা

সমাজ কর্তৃক আরোপিত নয় বরং দক্ষতা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের এই সেশনের ফলোআপ হিসেবে জেমস ডায়েরির ১৩-১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় "শ্রম বিভাজন" অধ্যায়টি পড়তে বলুন এবং পরবর্তী সেশনে তাদের এ সম্পর্কে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন।

সহায়ক তথ্য

১.৩.১ শ্রম বিভাজন:

মিসেস রোকেয়া ৪০ বছর বয়স্কা একজন গৃহবধূ। তিনি একজন স্থপতি। তাঁর কলেজ পড়ুয়া দুই জন সন্তান আছে। তাঁর স্বামী সরকারি চাকরি করেন।

মিসেস রোকেয়া একটি ফার্মে চাকরি করছিলেন। তাঁর সন্তান দু'টি যখন উপরের শ্রেণিতে উঠলো, তখন তাঁর স্বামীর মনে হলো যে তাঁর (রোকেয়ার) সংসারে আরো বেশি সময় দেয়া দরকার। তাই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর গৃহিণী হয়ে গেলেন। এখন তাঁর সন্তানরা বড় হয়েছে এবং পড়াশোনাতে স্থির হয়েছে।

তিনি ভাবেন তাঁর স্বামী যদি তখন তাঁর ঘরের কাজে সামান্যতম সাহায্য করতেন তাহলে তিনি সহজেই চাকরিটি চালিয়ে যেতে পারতেন। মিসেস রোকেয়া যখনই তার বন্ধুদের চাকরি করতে দেখেন তখনই তিনি আফসোস করেন।

রোকেয়ার গল্পটি কি পরিচিত মনে হয়?

গৃহস্থালি কাজের দায়-দায়িত্ব বলতে শুধু নারীদেরই বুঝানো হয় কেন?

রোকেয়ার স্বামী ও সন্তানদের মতাদর্শগত প্রতিক্রিয়া কী? এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী?

১.৩.২ নারী পুরুষের কাজের ধরন:

ঘরে ও বাইরে পুরুষ ও নারীর কাজ হিসেবে চিহ্নিত কাজগুলোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নারীরা ঘরের ভিতরে রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছা ও সেলাইয়ের কাজ করে অথচ পুরুষেরা ঘরের বাইরে শেফ/বাবুর্চি, দর্জি ও ধোপার কাজ করে। একই কাজ হওয়া সত্ত্বেও ঘরে ও বাইরে হওয়ার কারণে এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বাইরে পুরুষের কাজ বেশি গুরুত্ব পায়, গৃহস্থালি কাজ সত্যিকারের শ্রম হিসেবে বিবেচিতই হয় না। আমাদের সমাজে দেখা যায়, বেশিরভাগ নারী কম বা বিনা পারিশ্রমিকের কাজে যুক্ত থাকে, যার জন্য বাইরে কম যেতে হয়। অন্যদিকে পুরুষেরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কাজে উচ্চ বেতনে কাজ করে, যেখানে অধিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকে।

সারা জীবন ধরে নারীরা বিপুল কাজের বোঝা বহন করে। সমস্ত গৃহস্থালি কাজ-কর্মের দায় অন্যায়ভাবে তাদের ওপর চাপানো হয়। ফলে তারা বাইরের জগতের আয় উপার্জন ও সম্মানজনক কাজ করার সুযোগ পায় না। গৃহস্থালি কাজকে আবার সমাজ মূল্য দেয় না। অথচ এসব সাংসারিক কাজ ছাড়া মানুষের জীবন অচল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষের কাজ অনেক বেশি গুরুত্ব বা মূল্য পায়। এখন অবশ্য অনেক নারী ঘরের বাইরে গিয়ে রোজগার করে। তবে এখানেও বৈষম্য আছে। কম মজুরির এবং বেশি খাটুনির কাজে তাদের বেশি সুযোগ দেয়া হয়। ভালো আয় ও সম্মানের কাজ নারীর ভাগ্যে কম জোটে। আবার কর্মজীবী বা চাকরিজীবী মেয়েরাও ঘর-সংসারের কাজের দায় থেকে রেহাই পায় না। আসলে এসব নারীরা একদিকে

বাইরে বেতন নিয়ে কাজ করে। অন্যদিকে বাসায় ফিরে বিনা বেতনের কাজের বোঝা মাথায় নেয়। এসবের কারণে নারীদের শ্রমঘণ্টা দীর্ঘ হয়। তাদের অবসর বিনোদনের সুযোগও কম থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো: পুরুষের দেহে কি এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা উপাদান রয়েছে, যা তাকে সবল, সাহসী, আয় উপার্জনকারী, সিদ্ধান্তদাতা, ক্ষমতাবান করে তোলে। অনুরূপভাবে নারীর কি কোনো দৈহিক ঘাটতি বা বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উপাদান আছে, যার জন্য সে মানসিকভাবে দুর্বল, ভীরু, লাজুক ও পরনির্ভরশীল হয়। আসলে নারী-পুরুষের এই সামাজিক পরিচয় সমাজ থেকে গড়ে উঠেছে। এর জন্য তাদের দেহ দায়ী নয়। প্রকৃতি মানুষকে নারী ও পুরুষরূপে আলাদা আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বৈষম্য বা অসম করেনি। বরং সমাজ হাজার হাজার বছর ধরে নারী ও পুরুষের ভিন্ন সামাজিক পরিচয় দিয়েছে। সমাজ নারীকে এক রকমভাবে এবং পুরুষকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছে ও পরিচিত করেছে। নারী ও পুরুষের এই সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি বৈষম্যমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট। কেননা সমাজ সৃষ্ট এই পরিচয়ের মাধ্যমে নারীকে মন্দভাবে বা নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: নারী ক্ষমতাহীন, দুর্বল, ভীরু, পরনির্ভরশীল, লাজুক ইত্যাদি। অন্যদিকে সমাজ পুরুষকে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন। যেমন: তারা হলো ক্ষমতাবান, সবল, আত্মনির্ভরশীল, আয়-উপার্জনকারী, সাহসী ইত্যাদি।

একটু গভীরভাবে আমাদের চারপাশে ও সমাজে ছেলে-মেয়েদের জীবনে নজর দিলে দেখা যায়, সমাজ মেয়েদের শেখায় যে, তারা গৃহস্থালি কাজ করবে ও ভবিষ্যতে সংসার দেখাশুনা করবে। আর ছেলেদের স্কুলে পাঠানো হয় এবং সমাজ সংসারের কর্তা হয়ে নারীদের ভরণ-পোষণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে তাকে শেখানো হয়। পরিবারে ছেলেদের রান্নাঘরে যেতে ও গৃহস্থালি কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়। এরকম ধারণা থেকেই নিশির বাবা ও চাচারা তাকে কলেজে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি মি. মুহিত আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তার মেয়েদের তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল সাধারণ মানের স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ তাঁর কাছে মেয়েদের শিক্ষা প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পায়নি। দেখা যায় যে, একই পরিবারে ছেলেরা বিকশিত হওয়ার সব রকম সুযোগ-সুবিধা পেলেও মেয়েরা তা থেকে বঞ্চিত হয়।

স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত বা সনাতনী (স্টেরিওটাইপ) জেন্ডার পার্থক্য করে থাকে। স্কুলের অনুষ্ঠানে ছেলেদের দেয়া হয় অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও আয়োজনের দায়িত্ব, আর মেয়েদের বলা হয় উদ্বোধনী সংগীত গাইবার জন্য। ক্লাসে ছেলেদের ভারি চেয়ার-টেবিল সরাতে বলা হলেও মেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ দেয়া হয়। ছেলেদের বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। অথচ অনেক স্কুলে মেয়েদের জন্য এ ধরনের কোনো আয়োজনই নেই। খেলাধুলা ছেলেদের পেশির বিকাশই শুধু ঘটায় না বরং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দরকষাকষিসহ (নেগোসিয়েশন) অনেক কিছুই শেখায় যা থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হয়। আসলে কেউ দক্ষতা নিয়ে জন্মায় না, এগুলো জানতে ও শিখতে হয়। আপনি হয়তো পরিবারে বা পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য দেখেছেন। এরকম কেন হয়? পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধই এর মূল কারণ। পিতৃতন্ত্র একটি বিশেষ ব্যবস্থা যা মেয়েদের নানান প্রক্রিয়ায় অধীন করে রাখে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক জেন্ডার সংবেদনশীল করা হয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীলতা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে তুলনা বুঝায় না। পক্ষান্তরে, যেকোনো শিক্ষা যা জেন্ডার সংবেদনশীল তা উভয় লিঙ্গের জন্যই মঙ্গলজনক। এটা তাদের নির্ধারণ করতে সাহায্য করে কোন জেন্ডার বিষয়ক ধারণাগুলো যথার্থ এবং কোনগুলো সাধারণভাবে গতানুগতিক। জেন্ডার সচেতনতা নারী-পুরুষ উভয়ের বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় এবং তাদের সার্বিক মানবিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সমান সুযোগ দেয়া হলে মেয়েরাও তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে এবং সে সব পেশায় যোগদান করতে পারে; যা আগে শুধু ছেলেদের পেশা হিসেবে ধরা হতো এবং সমাজ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখে বলে গণ্য করা হতো। ছেলে-মেয়েদের দক্ষতা উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পন্থা ঠিক করার জন্য সমান সুযোগ দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছেলে বা মেয়ে যা-ই হোক না কেন, তাদের আগ্রহ ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ রচনার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। সমান সুযোগ না দেয়া বা অস্বীকার করা মেয়েদের প্রতি শুধু বৈষম্যই নয়, তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনও বটে। মেয়েদের বেড়ে ওঠা ও বিকাশের জন্য সমান সুযোগ দিতে হবে।

১.৩.৩ শ্রম বিভাজন ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়:

- পরিবারের কাজ প্রত্যেকের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া;
- কোন কাজকে ছেলেদের বা মেয়েদের কাজ বলে লেবেল না দেয়া;
- মা যদি গৃহিণী হন তার কাজে ছেলে, মেয়ে, বাবা সকলের সহযোগিতা করা;
- কর্মজীবী মা হলে বাড়িতে ফিরে মা যে কাজগুলো করেন, তা সবাই মিলে ভাগ করে করা;
- ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য সমান সুযোগ দেয়া।

বর্ষ-১ (এক) মডিউল-২

বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য

২.ক. উদ্দেশ্য

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা

২.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা:

- বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- শারীরিক গঠন নিয়ে মনোসামাজিক চাপ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- মাসিক ও মাসিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- স্বপ্নদোষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হবে।

২.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন
- অধিবেশন ২ - মাসিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- অধিবেশন ৩ - স্বপ্নদোষ ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

অধিবেশন ১ - বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- শারীরিক গঠন নিয়ে মনোসামাজিক চাপ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

দলগত কাজ ও মুক্ত আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

পেপার/পোস্টার পেপার, মার্কার, চক ও বোর্ড, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

কার্যক্রমটি এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। শারীরিক পরিবর্তন বর্ণনার ক্ষেত্রে শারীরিক অঙ্গগুলোর আঞ্চলিক নাম পরিহারের উপর জোর দিন। শিক্ষার্থীদের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হোন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- অধিবেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
  - পাঁচ বছর আগে তুমি দেখতে যেমন ছিলে, এখনও কি সেরকম আছো?
  - তোমরা কি তোমাদের শরীরে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছ? সেগুলো কেমন?
  - তোমরা কি নিজেদের মাঝে কোনো আচরণগত বা মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করেছ? সেগুলো কেমন?
  - এই পরিবর্তনগুলো কেন হয়? এটা কি স্বাভাবিক? সবাই কি একইভাবে বড় হয়/একই সময়ে এবং একই গতিতে?
  - এই পরিবর্তনের সময়টাকে কী বলে?
- এবার বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন– এ সময়ে কী ধরনের মানসিক পরিবর্তন হতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন। (সহায়ক তথ্য- ২.১.১, ২.১.২, ২.১.৩ এবং ২.১.৪ এর সাহায্য নিন)

দলগত কাজ:

- শিক্ষার্থীদের ছয়টি দলে ভাগ করে দিন।
- প্রতি দলে ৫ থেকে ৬ জন সদস্য থাকবে।
- এবার ৩টি দলকে 'বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন' এবং বাকি ৩টি দলকে 'বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন' পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। দলগুলোকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। এবার সহায়ক তথ্য ২.১.৩ ও ২.১.৪ এর মাধ্যমে ধারণাকে স্পষ্ট করে দিন।

মুক্ত আলোচনা:

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন:
  - বয়ঃসন্ধিকালে বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরী কি তাদের চেহারা নিয়ে নিশ্চিন্তে ও স্বস্তিতে থাকে, নাকি তারা দেখতে কেমন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে?
  - বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র এবং সমাজের অন্যদের কাছ থেকে কিশোর-কিশোরীরা তাদের চেহারা ও শরীর দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কী ধরনের বার্তা এবং ছবি পেয়ে থাকে?
  - এই চাপ কী মেয়েদের উপর বেশি নাকি ছেলেদের উপর বেশি?
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে উত্তরগুলো জেনে নিন। ব্যাখ্যা করুন বিজ্ঞাপন কিংবা চলচ্চিত্রে নায়ক নায়িকাদের যেভাবে দেখানো হয় তা অনেক সময়ই তাদের স্বাভাবিক চেহারা থেকে ভিন্ন হয়।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, বেশিরভাগ মানুষই কি চেহারা বা শারীরিক গঠন দ্বারা বিবেচিত হতে চায়? অন্য কোন গুণাবলির জন্য মানুষ অন্যের প্রশংসা আশা করে? মেধাবী, সৎ, রসিক, জ্ঞানী, পরিশ্রমী, সাহসী, দয়ালু, শিল্পী, গায়ক, খেলোয়াড়, উদার, নীতিবান, ভালো শ্রোতা, বিশ্বাসী এবং এরকম অন্য গুণাবলি। কমপক্ষে আট থেকে দশটি বৈশিষ্ট্য মনোসমীক্ষণ পদ্ধতিতে তৈরি করুন এবং বোর্ডে লিখুন।
- ব্যাখ্যা করুন, আমরা সবাই আমাদের গুণাবলির জন্য প্রশংসিত হতে চাই এবং গুণাবলিই আমাদের অন্যের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।
- এবার সহায়ক তথ্য- ২.১.৬ এর আলোকে শারীরিক গঠন নিয়ে মনোসামাজিক চাপ কীভাবে কিশোর কিশোরীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং এতে তাদের কী সমস্যা হতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন।
- কিশোর-কিশোরীরা এই মনোসামাজিক চাপ কীভাবে মোকাবিলা করতে পারে তার কৌশল ব্যাখ্যা করুন।
- এবার সহায়ক তথ্যের (২.১.৫-২.১.৬) মাধ্যমে এ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন। একই সাথে বয়ঃসন্ধি-কালের পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানার কারণে কী কী সমস্যায় পড়তে পারে তাও স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হোন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে তাদের মধ্যে ১ নম্বর ও ২ নম্বর কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।

১. বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন

২. মনোসামাজিক চাপ মোকাবেলার উপায়

সার-সংক্ষেপ:

কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের শরীর সম্পর্কে জানতে হবে। প্রত্যেকেরই এই শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়, কারও আগে কারও পরে। শরীরের এই পরিবর্তন নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, হতাশ বা বিব্রত হওয়া যাবে না বরং সচেতন হতে হবে।

মূল বার্তা

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের এই সেশনের ফলোআপ হিসেবে জেমস ডায়েরির ৪৩ নম্বর পৃষ্ঠায় 'জানো, জানাও' অধ্যায়টি এবং ৪৪ নম্বর পৃষ্ঠায় 'জীবন ডাকছে তোমায়' ছড়াটি পড়তে বলুন এবং পরবর্তী সেশনে তাদেরকে এ সম্পর্কে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন।

সহায়ক তথ্য

২.১ বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

২.১.১ বয়ঃসন্ধিকাল

জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর এই নির্দিষ্ট অবস্থাকে আমরা বয়ঃসন্ধিকাল বলি। সাধারণত বয়স যখন ০৯-১৩ বছর হয় তখন থেকেই মেয়েরা শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করে এবং এই সময়ে তাদের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অনুভূত হয় ১২-১৫ বছর বয়সে। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর পর্যন্ত বয়সকে বয়ঃসন্ধিকাল ধরা হয়।

২.১.২ হরমোন

কী কারণে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে? শরীরের এই পরিবর্তন কী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমাদের শরীর ক্রমাগতভাবে হরমোন তৈরি করে, এই হরমোন হলো এক ধরনের বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের মস্তিষ্ক থেকে নিঃসরিত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে আমাদের মস্তিষ্ক হতে এক ধরনের হরমোন নিঃসরিত হয় যাকে আমরা গ্রোথ হরমোন বলি, যা আমাদের শারীরিক বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। বয়ঃসন্ধিকালে এই বৃদ্ধি হরমোনের সাথে সাথে এক ধরনের সেক্স হরমোনও নিঃসরিত হয়। এই সেক্স হরমোনই পুরুষ ও নারীর মধ্যে শারীরিক আকার-আকৃতির পার্থক্য গড়ে দেয়। হরমোন শুধু শরীর নয় মনকেও প্রভাবিত করে।

২.১.৩ পরিবর্তনশীল শরীর

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীর শরীরে পরিবর্তন শুরু হয়। এ সময়ে তারা বড় হয়, লম্বা হয়। কিশোরীদের ক্ষেত্রে স্তন ভারি হয় এবং নিতম্ব বড় হওয়া শুরু করে। সাধারণত কাঁধের চেয়ে নিতম্ব দ্রুত বড় হয়। নিতম্ব প্রশস্ত হওয়ার কারণে কোমর দেখতে সরু মনে হয়। ছেলেদের কাঁধ প্রশস্ত হয়, হাত এবং পা পেশিবহুল হয়ে ওঠে। ছেলেদের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়। মেয়েদের মাসিক হয় এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ হয়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের ত্বক ও চুলে পরিবর্তন আসে। অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীর ত্বক তৈলাক্ত হওয়ার ফলে ব্রণ হতে পারে যা নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। এ সবই বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে চুল গজানোও বয়ঃসন্ধির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই সময় অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের হাতে, পায়ে, যৌনাঙ্গে ও বগলে চুল গজায়। তাছাড়া ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজায়। অধিকাংশ ছেলের ক্ষেত্রে ১৪-১৮ বছরে দাড়িগোঁফ ওঠা শুরু হয়। তবে তা আরও আগে বা পরেও শুরু হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে যে প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গতি নিয়ে বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে। একটি মেয়ের শারীরিক বৃদ্ধি তার বান্ধবীর তুলনায় ধীরে হতে পারে। অথবা কোনো ছেলের এমন বন্ধু থাকতে পারে যার গলার স্বর ১৩ বছর বয়সের আগেই বড়দের মতো হয়ে গেছে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের এটা বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে, এই পরিবর্তন যার যখন হচ্ছে সেটাই তার জন্য সঠিক সময়।

২.১.৪ পরিবর্তনশীল মন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীর ও মনে পরিবর্তন ঘটে। এ সময় তারা তীব্র আবেগ অনুভব করে। অনেক কিশোর-কিশোরী নিজের ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকে। কারণ তারা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। কখনো হাসিখুশি, পরক্ষণেই আবার মনমরা হতে পারে, এমনকি কেঁদেও ফেলতে পারে। হয়তো কোনোদিন মন খুব ভালো আবার পরের দিন মেজাজ খুব খারাপ। এ সময় কিশোর-কিশোরীদের এমন মানসিক অবস্থা খুবই স্বাভাবিক। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা একটু সন্দেহপ্রবণ বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে অথবা আবেগ এতটাই প্রকট হয়, যা আগে কখনো অনুভূত হয়নি। তারা হয়তো ছোট কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে যেটা হয়তো অন্যের কাছে ধরাই পড়বে না। তাদের হয়তো মনে হতে পারে এই সমস্যাটা তারা ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারছে না, এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যরাও নয়। এসব ক্ষেত্রে তারা খুব একাকিত্ব অনুভব করে।

অন্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ নিয়েও এ সময় কিশোর-কিশোরীরা সমস্যায় পড়ে যায়। পিতামাতার সাথে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া এবং বন্ধুদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেও তাদের মধ্যে আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়। বড়দের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে তারা বন্ধুদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সাধারণত কিশোর-কিশোরীরা তাদের বন্ধুদের দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয় এবং কখনো কখনো পরিণাম না ভেবেই বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে ফেলে। বিভিন্ন তথ্যের জন্য তারা তাদের বন্ধু-বান্ধবের শরণাপন্ন হয়। অনেকসময় এসব বন্ধুরা অননুমোদিত বইপত্র পড়ে ও ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের শরণাপন্ন হয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল তথ্য দিয়ে থাকে। ফলে তারা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করে থাকে।

২.১.৫ বয়ঃসন্ধিকালে আবেগীয় সহযোগিতা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আচরণগত পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের শরীর ও মনে পরিবর্তন ঘটে। এ সময় অধিকাংশই জানে না কোথায় তারা সহযোগিতা পেতে পারে। অনেকেরই বড় ভাই-বোন থাকে না, যার সাথে এ বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবাও বন্ধুসুলভ থাকে না। এই সময় তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকে এবং তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাদের মেজাজ, রাগ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। এসময় তাদের প্রতি সকলের সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। তাদের আরও স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা প্রয়োজন, তবে যেকোনো সমস্যা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করার মানসিকতা তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এসময় নিজের সম্পর্কে অনেক কৌতূহল, প্রশ্ন ও আগ্রহ থাকে। যেমন–

- বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুদের মতামত অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে;
- তারা দেখতে কেমন বা তাদের কেমন লাগে এ নিয়ে চিন্তিত থাকে;
- তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে (স্কুল, পরিবার, চাকরি ইত্যাদি);
- অন্যের প্রতি আকর্ষণ ও কৌতূহল বোধ করে;
- ধূমপান ও মাদকের প্রতি আগ্রহ ও আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে;
- স্কুলে সহপাঠীদের দ্বারা বিদ্রুপ ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

এই সকল নতুন অনুভূতি বা আবেগ একেবারেই স্বাভাবিক। বড় হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকাটাও স্বাভাবিক। এসব কিছু নিয়ে নিজেকে দোষী ভাবার কোনো কারণ নেই বরং বিষয়গুলোর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। আবেগ ও অনুভূতির এই বিষয়গুলো মা, বাবা অথবা বিশ্বস্ত কারও কাছে এ বিষয়ে সহযোগিতা পেলে বা কথা বলতে পারলে এটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

২.১.৬ প্রত্যেকেই আলাদা

শারীরিক গঠন ও চেহারার ব্যাপারে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো আকর্ষণীয় এবং কোনগুলো আকর্ষণীয় না, সে ব্যাপারে আমাদের সমাজে কিছু প্রথাগত ধারণা প্রচলিত আছে, যেমন– কারো গায়ের রং ফর্সা হলে তাকে আকর্ষণীয় ভাবা হয়। এছাড়াও মিডিয়া (টিভি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন) কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম) আমাদের শারীরিক গঠন সম্পর্কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে । এসব বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কিশোর-কিশোরীদের মনে কিছু চিন্তাধারা গেঁথে যেতে থাকে যে, জীবনে সুখী হতে চাইলে, সমাজে স্বীকৃতি পেতে চাইলে তাদের শারীরিক গঠন ও চেহারা সমাজ অথবা বিভিন্ন মিডিয়া দ্বারা বেঁধে দেয়া গণ্ডির মধ্যে হতে হবে।

নিজেদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য (যেমন গায়ের রং, ওজন) নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা ইতিবাচক হলে তাদের মানসিক অবস্থা ভালো থাকে। কিন্তু কোনো কিশোর বা কিশোরী যদি নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা চেহারা নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে তাহলে সে মনোসামাজিক চাপের শিকার হয় এবং এটি তার আত্মবিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে তার মাঝে খাদ্যাভ্যাসের বিশৃঙ্খলা, উদ্বেগ কিংবা বিষণ্নতা এবং কারও কারও ক্ষেত্রে মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কিশোর- কিশোরীদের বোঝাতে হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজের মতো করে সুন্দর এবং এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের অন্যের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ একজন ব্যক্তি দেখতে কেমন হবে তা নির্ধারিত হয় তার বংশগতি দ্বারা যা সহজে বদলানো যায় না। তাই আমরা প্রত্যেকেই আলাদা এবং আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলোও স্বতন্ত্র। তাছাড়া একজন মানুষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং তার ভেতরের সৌন্দর্য বা তার গুণাবলিই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।

অধিবেশন ২ - মাসিক ব্যবস্থাপনা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মাসিক সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

গল্প বলা, আলোচনা, দলগত কাজ ও জোড়ায় কাজ

ঘ) উপকরণ:

পেপার/ পোস্টার পেপার, মার্কার কলম, চক ও বোর্ড

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

কার্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সেক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ দিন এবং বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন। মাসিক নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের মনে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, সেশন চলাকালীন সেই বিষয়ে সচেতনতার সাথে আলোচনা করুন। স্পর্শকাতর বা ব্যক্তিগত বিষয় আলোচনার সময় উঠে এলে শিক্ষার্থীদের সেসব বিষয়ে গোপনীয়তা মেনে চলতে বলুন। মাসিক সম্পর্কিত কারও ব্যক্তিগত বিষয় উত্থাপিত হলে তা নিয়ে হাসাহাসি করতে মানা করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।
- অধিবেশনের শুরুতে বোর্ডে 'মাসিক' শব্দটি বড় করে লিখুন। সকলকে প্রশ্ন করুন 'মাসিক' বলতে তোমরা কে কী বোঝ?
- উত্তরগুলো বোর্ডে লেখা 'মাসিক' শব্দটির চারপাশে লিখুন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের 'মাসিক' সম্পর্কে ধারণা দিন।
- এবার শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ৫৫ নম্বর পৃষ্ঠার ঝর্ণার গল্পটি পড়তে বলুন।

গল্পটি পড়ার পর শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করুন:

- মাসিকের রক্ত কি দূষিত?
- মাসিকের রক্তপাতের সময় কী করা দরকার?
- মাসিকের কাপড় বা প্যাড কখন বা কত সময় পর পর পরিবর্তন করতে হবে?

এবার সহায়ক তথ্যের (২.২.১) সাহায্য নিয়ে মাসিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায় 'মাসিক নিয়ে কিছু কথা' অংশটি পড়ে নিতে বলুন।

জোড়ায় কাজ:

- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে মাসিক সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলুন।
- কয়েকটি জোড়াকে দাঁড় করিয়ে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যদেরও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।
- সহায়ক তথ্যের (২.২.২) মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণাগুলো ভেঙে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য প্রদান করুন।

দলগত কাজ:

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। এক্ষেত্রে ছেলেদের, ছেলেদের দলে এবং মেয়েদের, মেয়েদের দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে ৫ থেকে ৬ জন সদস্য থাকবে।
- দলগত কাজের প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন - কীভাবে তোমরা তোমাদের শরীরের সকল অঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখতে পারো?
- উত্তরগুলো শুনুন এবং এ সম্পর্কে ধারণাগুলো সহায়ক তথ্যের ২.৩.৪ এর আলোকে স্পষ্ট করুন।
- এরপর মাসিকের সময় করণীয় কী? তা প্রতিটি দলকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। লেখা শেষে দলগুলোকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষে মাসিককালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা দিন। (সহায়ক তথ্যের ২.২.৩ সাহায্য নিন)

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ ও জোড়ায় কাজের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

মাসিক দুশ্চিন্তার কোনো বিষয় নয় বরং এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মাসিকের সম্পূর্ণ বিষয়টি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাসিকের সময় শরীরের যত্ন নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মূল বার্তা

লজ্জা নয়, মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের এই অধিবেশনের পর জেমস ডায়েরির ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কিছু পরামর্শ' অনুচ্ছেদটি পড়তে বলুন। এরপর আলোচনা করুন যে, বয়ঃসন্ধিকালে সুস্থ থাকা এবং নিজের মধ্যে ভালো অনুভূতি বোধ করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি।

সহায়ক তথ্য

২.২.১ মাসিক

মেয়েদের শরীরের বিশেষ পরিবর্তন হিসেবে মাসিক শুরু হয় যা সেক্স হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতি মাসে মেয়েদের যোনিপথ দিয়ে যে রক্ত বের হয় তাকেই মাসিক বলে। মাসিক চক্রাকারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। মেয়েদের ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সে যেকোনো সময় মাসিক হয় এবং ৪৫-৪৯ বছর বয়সে তা স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত মাসিক চক্রটি ২৮ দিনের হয়, কিন্তু এ চক্রটি ২৪-৩৫ দিনেরও হতে পারে। এর কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মাসেই মাসিক হয় এবং তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। তবে মাসিক চক্র শুরু হওয়ার প্রথম দুই বছরে অনিয়মিত মাসিক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মাসিকের সময়টাতে শরীর ও মনে অস্বস্তিভাব দেখা দেয়া, অল্পতেই মেজাজ খারাপ হওয়া এবং চলা ফেরায় বিব্রতভাব দেখা দেয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মানসিকভাবে এই শারীরিক পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রথম দিকে একটু সমস্যা হলেও আস্তে আস্তে তা কেটে যাবে।

২.২.২ মাসিক সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও সঠিক তথ্য

ভ্রান্ত ধারণা	সঠিক তথ্য
▪ অনেকে মনে করে এটা এক ধরনের রোগ; ▪ মাসিকের সময় টক, ঝাল, মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া যাবে না; ▪ কোনো কাজকর্ম, খেলাধুলা করা যাবে না; ▪ গোসল করা যাবে না; ▪ বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না।	▪ এটা স্বাভাবিক বিষয়; ▪ নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে; ▪ স্বাভাবিক কাজকর্ম ও খেলাধুলা করতে হবে।

২.২.৩ মাসিক ব্যবস্থাপনা

মাসিকের সময় রক্ত গড়িয়ে যাতে বাইরে না পড়ে, সেজন্য সাধারণত পরিষ্কার কাপড়, তুলা বা স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এগুলো ব্যবহারের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

কাপড়

- ব্যবহার্য কাপড়টি অবশ্যই পরিষ্কার ও শুকনা থাকা প্রয়োজন। ব্যবহৃত কাপড় ৩/৪ ঘণ্টা পরপর পাল্টাতে হবে।
- কাপড় ধোয়ার আগে সম্ভব হলে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে কাপড়ে দাগ তুলতে সহজ হয়। এরপর সাবান ও গরম পানি দিয়ে কাপড়টি ধুয়ে ফেলতে হবে।
- ধোয়া কাপড় অবশ্যই পরিষ্কার, কড়া রোদ ও বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে শুকাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এটি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ঝোঁপঝাড় বা গাছে এই কাপড় শুকাতে দেয়া যাবে না। কড়া রোদে শুকালে রোগজীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়। তবে ব্যবহৃত কাপড়টি নির্দিষ্ট সময় পরে বদলে নিয়ে নতুন কাপড় ব্যবহার করা উচিত।
- মাসিক চলাকালে ৫/৬ টা কাপড় রাখতে হবে যাতে করে সবসময় শুকনা কাপড়ের মজুদ থাকে।
- মাসিক শেষ হলে কাপড়গুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে, শুকিয়ে, ভাঁজ করে প্লাস্টিক বা কাপড়ের ব্যাগে ঢুকিয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে।

স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড

- স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা পর পর পাল্টাতে হবে।
- ব্যবহার শেষে কাগজে মুড়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে অথবা গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সময়মতো ন্যাপকিন/প্যাড না পাল্টানো বা অধিক সময় পরিধান করে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, এতে করে ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন ও রোগ হবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে নিয়মিত গোসল করা ও যৌনাঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। মাসিকের সময় সঠিক পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন বৃদ্ধি পেয়ে পায়ুপথ পর্যন্ত ছড়াতে পারে এবং দুর্গন্ধ হতে পারে।

এছাড়া মনে রাখতে হবে–

- যৌনাঙ্গের ভেতর বা এর চারপাশ পরিষ্কার রাখার জন্য কোনো ধরনের সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট।
- মাসিক চলাকালীন নিয়মিত গোসল করতে হবে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরতে হবে এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত কাপড় বা প্যাড কাগজে মুড়ে স্কুল ব্যাগে রেখে দেয়া যেতে পারে। হঠাৎ স্কুলে থাকাকালীন মাসিক শুরু হলে এটি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে।
- স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন/প্যাড এর মজুদ রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্কুল পরিচালনা কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

পেট ব্যথা ও অস্বস্তি

মাসিকের সময় বিশেষ এক ধরনের হরমোনের কারণে জরায়ুর সংকোচন (ছোট হওয়া) ঘটে। এ কারণে তলপেট বা কোমরে ব্যথা অনুভূত হয়। এ বিষয়ে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই ভিন্ন। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথার সাথে অবসাদ, ঘাম, মাথা ঘোরা, কাঁপুনি, বমি বমি ভাব অথবা বমি হতে পারে। তবে, সকলেরই যে ব্যথা হয় এমন নয়। এ সময় বিশ্রাম, হালকা ব্যায়াম বা গরম সেঁক ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। তবে ব্যথা বেশি ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে।

- এই সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম ও বিশ্রাম প্রয়োজন।
- পেটের চারপাশে হালকা ম্যাসেজ করলে কিংবা হালকা ব্যায়াম করলে অনেক সময় ব্যথা কমে যায়। এছাড়া গরম পানি দিয়ে গোসল করলে কিংবা গরম পানি ভর্তি বোতলে তোয়ালে পেঁচিয়ে বা হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে তলপেটে সেঁক দিলে ব্যথা কমতে পারে।

মাসিক চলাকালে খাদ্য ও পুষ্টি

অনেকের মধ্যেই ধারণা থাকে, মাসিকের সময় দৈনন্দিন কাজকর্ম করা যায় না, এটি ভুল। অন্য সময়গুলোর মতো এসময়ও সকল স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়। এই সময় যেহেতু শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যায়, তাই স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্ত লাগে। অন্যদিকে, কেউ যদি আগে থেকেই অপুষ্টিতে ভোগে, তাহলে এই সময় রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। তাই মাসের বিশেষ এই সময়টিসহ অন্য সময়গুলোতেও মাছ, মাংস, ডিমসহ সব ধরনের পুষ্টিকর খাবার বিশেষ করে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেমন - কচুশাক, লালশাক বা কলিজা ইত্যাদি। মাসিকের সময় টক খাবার খাওয়া যাবে না ধারণাটি ঠিক নয়। বরং লেবু, কমলা, আমলকি ও জলপাইয়ের মতো টক জাতীয় ফল এবং ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ অন্যান্য ফল খেতে হবে। ভিটামিন সি শরীরে আয়রন শোষণে সহায়তা করে। এসময় বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে।

অধিবেশন ৩ - স্বপ্নদোষ ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- স্বপ্নদোষ সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

একক কাজ, দলগত কাজ ও আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

পেপার/ পোস্টার পেপার, মার্কার কলম, চক ও বোর্ড, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

কার্যক্রমটি শিক্ষার্থীদের এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সেক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ দিন এবং বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন। স্বপ্নদোষ নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের মনে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা থাকায়, সেশন চলাকালীন ভ্রান্ত বিষয়গুলো সচেতনতার সাথে আলোচনা করুন। স্পর্শকাতর বা ব্যক্তিগত বিষয় আলোচনার সময় উঠে এলে শিক্ষার্থীদের সেসব বিষয়ে গোপনীয়তা মেনে চলতে বলুন। স্বপ্নদোষ সম্পর্কিত কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে বলুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- সবাইকে বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন বিষয়ক অধিবেশনের কথা মনে করতে বলুন। বলুন যে, কিশোরীরা যেমন তাদের মাসিক শুরু হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে, কিশোররাও তেমনি স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে বিচলিত হয়ে পড়ে।

- এবার স্বপ্নদোষ সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলো করুন–
  - স্বপ্নদোষ কী?
  - স্বপ্নদোষ কেন হয়?
  - স্বপ্নদোষ হলে কী করতে হয়?

- এবার স্বপ্নদোষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন (সহায়ক তথ্য ২.৩.১ এর সাহায্য নিন)।

একক কাজ:

- শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে নিজ নিজ খাতায় স্বপ্নদোষ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলো লিখতে বলুন। কয়েকজনকে দাঁড় করিয়ে তাদের উত্তরগুলো শুনুন।
- সহায়ক তথ্য ২.৩.২ এর আলোকে স্বপ্নদোষ নিয়ে ভুল ধারণাগুলো স্পষ্ট করুন।

দলগত কাজ:

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিন। এক্ষেত্রে ছেলেদের, ছেলেদের দলে এবং মেয়েদের, মেয়েদের দলে ভাগ করে দিন। প্রতি দলে ৫ থেকে ৬ জন সদস্য থাকবে।
- প্রতিটি দলকে পোস্টার পেপারে দু'টি ভাগে কলাম তৈরি করতে বলুন। যার একপাশে 'ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা' ও অন্য পাশে 'প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয়' কী তা পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- দলগুলোকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- এবার সহায়ক তথ্য ২.৩.৩ ও ২.৩.৪ এর আলোকে ধারণাগুলোকে স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

স্বপ্নদোষ বয়ঃসন্ধিকালের/কিশোর বয়সের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। এটি কোনো রোগ নয় এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকরও নয়। ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হলে ঘাবড়ে না গিয়ে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।

মূল বার্তা

স্বপ্নদোষ স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া, এটা কোনো রোগ নয়।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের এই অধিবেশনের পর জেমস ডায়েরির ৫৭ পৃষ্ঠা থেকে 'স্বপ্নদোষ' অনুচ্ছেদটি দেখতে বলুন। এরপর ৫৮ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা' অনুচ্ছেদটি পড়তে বলুন। এরপর আলোচনা করুন যে, স্বপ্নদোষ একজন কিশোরের প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পরিচয়। তাই এতে ঘাবড়ে না গিয়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।

সহায়ক তথ্য

২.৩.১ স্বপ্নদোষ নিয়ে কিছু কথা

- বয়ঃসন্ধিকালে স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বপ্নদোষ শারীরিক কোনো অসুবিধা করে না, শরীরকে দুর্বলও করে না। সুতরাং এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
- একটি ছেলে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন তার বীর্য (ধাতু) তৈরি হতে শুরু করে। বীর্য যখন ঘুমের মধ্যে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে স্বপ্নদোষ বলে। এটি কোনো রোগ নয় তাই এর কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। স্বপ্নদোষ হলে স্বাভাবিক নিয়মে শরীর থেকে বীর্য বের হয়ে আসে।
- এটি একজন কিশোরের প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পরিচয়।

ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হলে ঘাবড়ে না গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।

২.৩.২ স্বপ্নদোষ নিয়ে ভুল ধারণা

ভ্রান্ত ধারণা	সঠিক তথ্য
▪ স্বপ্নদোষ একটি রোগ। এতে শরীর দুর্বল হয়ে যায়; ▪ শুধু খারাপ ছেলেরা যারা কুরুচিকর চিন্তা করে তাদেরই স্বপ্নদোষ হয়; ▪ স্বপ্নদোষের সময় বীর্যহানি শারীরিক দুর্বলতার কারণ; ▪ '৪০ বা ৮০ ফোঁটা রক্ত থেকে একফোঁটা বীর্য তৈরি হয়'– কথাটি একটি কুসংস্কার।	▪ এটা স্বাভাবিক বিষয়, শারীরিক দুর্বলতার সাথে স্বপ্নদোষের কোনো সম্পর্ক নেই; ▪ বয়ঃসন্ধিকালে সকল কিশোরদেরই স্বপ্নদোষ হয়; ▪ বীর্য মূলত শুক্রাণু ও বীর্যথলি থেকে নির্গত পাতলা পিচ্ছিল পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়।

২.৩.৩ স্বপ্নদোষ হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

- বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষের পর গোসল করা;
- নিয়মিত গোসল করা এবং বগল ও যৌনাঙ্গের চুল পরিষ্কার রাখা;
- প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে;
- মা, বাবা, বড় ভাই/বোনের সাথে বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা।

২.৩.৪ ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

বয়ঃসন্ধিকালে সুস্থ থাকা এবং নিজের মধ্যে ভালো অনুভূতি বোধ করার জন্য পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরি। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাকেও বোঝায়।

প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে বোঝায়। মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধু প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে বোঝায় না। এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা। পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সার্বিক সুস্বাস্থ্য তথা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে তাই বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। নানা কারণে প্রজনন অঙ্গের রোগ বা সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত বা সংক্রমিত হলে তা গোপন করা যাবে না। ডাক্তারের নির্দেশমতে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সংক্রামক রোগ ও যৌনরোগের ঝুঁকি (যেমন– সিফিলিস, গনোরিয়া, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি) থেকে মুক্ত থাকা যাবে। এসব রোগের সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কিছু পরামর্শ:

পরিষ্কার ত্বক: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের শরীরে ঘামের গন্ধ হয়। নিয়মিত গোসল করে শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। গোপনীয় অংশগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে। এতে শরীরে ঘামের গন্ধ থাকে না।

পরিষ্কার কাপড় চোপড়: পরিষ্কার অন্তর্বাসসহ সবসময়ই পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা উচিত। স্কুল থেকে ফিরে দ্রুত স্কুল ড্রেস খুলে ফেলা উচিত এবং ময়লা হলে না ধুয়ে পুনরায় পরা উচিত নয়। অন্যের ব্যবহৃত তোয়ালে/গামছা ও অন্তর্বাস ব্যবহার করা যাবে না।

পরিষ্কার হাত ও পা: কোনো কিছু খাওয়ার পূর্বে এবং বাইরে থেকে এসে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া দিনে অন্তত একবার পা ধোয়া প্রয়োজন। অতঃপর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা উচিত যাতে কোনো ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণ হতে না পারে।

পরিষ্কার চুল: আমাদের মাথায় অনেক ঘামগ্রন্থি আছে যেখান থেকে বের হওয়া ঘাম ও ধুলাবালু মিলে চুল তেলতেলে ও দুর্গন্ধযুক্ত করে। তাই নিয়মিত সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়া উচিত।

পরিষ্কার দাঁত: দিনে অন্তত দু'বার দাঁত মাজা দরকার এবং প্রতিবার খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা উচিত।

বর্ষ-১ (এক) মডিউল-৩

আবেগ

৩.ক. উদ্দেশ্য

আবেগ এবং আবেগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জন করা

৩.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বিভিন্ন ধরনের আবেগ বর্ণনা করতে পারবে;
- আবেগের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- আবেগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করতে পারবে;
- মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

৩.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - আবেগ অনুধাবন
- অধিবেশন ২ - আবেগ ব্যবস্থাপনা
- অধিবেশন ৩ - মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মনোসামাজিক সহায়তা

অধিবেশন ১ - আবেগ অনুধাবন

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বিভিন্ন ধরনের আবেগ বর্ণনা করতে পারবে;
- আবেগের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

প্রশ্নোত্তর, একক কাজ এবং দলগত কাজ

ঘ) উপকরণ:

পোস্টার পেপার, সুনির্দিষ্ট বক্তব্য সংবলিত চিরকুট (প্রত্যেক প্রকার আবেগের জন্য দু'টি চিরকুট), হোয়াইট বোর্ড, মার্কার অথবা ব্ল্যাকবোর্ড এবং চক

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

আবেগ সংক্রান্ত আলোচনা স্পর্শকাতর হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের অনুভূতির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। লক্ষ রাখতে হবে, কোনো শিক্ষার্থী তার আবেগ প্রকাশের সময় অন্যান্য শিক্ষার্থী যেন হাসি-তামাশা না করে। আবেগ প্রকাশে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে তার বক্তব্য যথাযথ সহানুভূতি/মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আবেগ কী এ সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি না জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আবেগের তালিকা করতে বলুন। তালিকায় উল্লিখিত আবেগগুলো বোর্ডে লিখুন। পূর্বে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রকার আবেগ সংবলিত চিরকুটের বাক্সটি টেবিলে রাখুন। এবার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বলুন একটি করে চিরকুট হাতে নিয়ে লেখাটি পড়ে শোনাতে। সবার পড়া শেষ হলে তাদের জিজ্ঞাসা করুন:

- নিজের চিরকুট পড়ার সময় তার কী অনুভূতি হয়েছিল?
- সে কী ভেবেছিল?
- তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারতো?
- এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কী?

এবার ৫/৬ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে চারটি দল গঠন করুন। নিচের ছকটি বোর্ডে এঁকে দিন। আবেগের বিপরীতে এর কারণ, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব নির্ধারিত ছক পূরণ করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্যের মাধ্যমে ছকে উল্লিখিত আবেগের কারণ, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিন।

আবেগ	কারণ	প্রতিক্রিয়া	প্রভাব
ক্রোধ			
সুখ			
বিষণ্নতা			
ভয়			
ভালোবাসা			

পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ ৪টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে নিচের প্রশ্নের আলোকে এবার শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন এবং সহায়ক তথ্য ৩.১.১ অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত ধারণাসমূহ স্পষ্ট করুন।

- তোমাদের এই কার্যক্রম কেমন লেগেছে?
- সাধারণত কী ধরনের আবেগ আমরা দেখতে পাই?
- তোমার বাস্তব জীবনের ঘটনার সাথে এসব বক্তব্যের কী কী মিল খুঁজে পাও?
- তোমাদের আবেগ নিয়ে কী ভাবো?
- তোমরা কি সবসময়ই আবেগের দ্বারা পরিচালিত হও? এটা কি ঠিক?
- আবেগ কীভাবে তোমাকে এবং অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে?

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনে নিন পোস্টার পেপারে তারা যে কাজটি উপস্থাপন করেছে, তা থেকে তারা কী কী জানতে পারলো। প্রয়োজনে প্রশ্নাবলির মাধ্যমে যেসব আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা শুনুন এবং নিশ্চিত হোন যে, এই অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত শিখনফলগুলো অর্জিত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ:

আবেগ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে মানুষ বিভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তির মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। আবেগের এই বহিঃপ্রকাশ নিজের ও অন্যদের কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।

মূল বার্তা

নারী-পুরুষ সব মানুষের জন্যই আবেগ সহজাত প্রাকৃতিক বিষয়, যা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনেরই হয়।

সহায়ক তথ্য

৩.১.১ আবেগ কী?

আবেগ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষ যুক্তির চেয়ে অনুভূতিকে প্রাধান্য দেয়। রাগ, ক্ষোভ, ভয়, বিষণ্নতা, আনন্দ, ভালোবাসা আর বিস্মিত হওয়া এসব অভিজ্ঞতা আমাদের সবার জীবনেই কমবেশি ঘটে। মানুষের জীবনে এসবই স্বাভাবিক এবং সাধারণ ঘটনা। এগুলোকে আবেগ বলে। আবেগ দুই ধরনের হয়– ইতিবাচক ও নেতিবাচক। আবেগ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়, যেমন– কেউ কেউ পরীক্ষায় ভালো ফল করলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, কখনো খুশি হলে লাফিয়ে ওঠে।

আনন্দ (Joy):

প্রেম, পূর্ণতা, পুলক, উল্লাস, আহ্লাদ ইত্যাদির একক, একাধিক বা সম্মিলিত অনুভূতিকে আনন্দ বা সুখ বলে। আনন্দ হলো সেই পন্থা যা অবলম্বনে উপযুক্ত ও উন্নত জীবনযাপন করা যায়। যেমন– পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য মা-বাবা অনেক খুশি হয়ে মজাদার খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেন বা নতুন পোশাক কিনে দেন অথবা কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান।

ভয় (Fear):

কোনো ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কা অথবা বেদনার অনুভূতি চিন্তা করে মানসিক যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় সেটাই হলো ভয়। ভয় থেকে মুক্ত থাকতে হলে বিপদকে চিনতে পারা, একে এড়িয়ে যাওয়া অথবা এর মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। একে বলে 'ভাগো অথবা লড়ো' (Flight or Fight Response) প্রতিক্রিয়া। যেমন– বজ্রপাত দেখে কারো বুক ধড়ফড় করে। কারো কারো পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় হাতের তালু ঘামতে থাকে।

বিষণ্নতা (Sadness):

বিষণ্নতা হচ্ছে এক ধরনের আবেগীয় কষ্ট যা কিনা অসহায়ত্ব, হারানোর কষ্ট, অসুবিধা, বিষাদ, ক্ষোভ, উত্তপ্ততা আর সর্বনাশের অনুভূতির সংমিশ্রণ। বিষণ্নতায় মানুষ নেতিবাচক আবেগী ও শক্তিহীন হয়। একাকী ও চুপচাপ থাকা বিষণ্নতার নির্দেশক। যেমন– আরিফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পলাশ দাদাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। আরিফ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে, স্কুলে যেতে চায় না, অসুস্থ বোধ করে।

রাগ (Anger):

রাগ হচ্ছে এক ধরনের নেতিবাচক আবেগ যা একটি অনিয়ন্ত্রিত মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে। কেউ মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে অথবা অন্যায় বা বঞ্চনার শিকার হলে রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। রাগান্বিত হলে মানুষ স্বাভাবিক চিন্তা করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তই সঠিক হয় না। তাই বলা হয় 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। যেমন- আমান ও রবিন ভালো বন্ধু। তারা একদিন বেঞ্চে বসা নিয়ে ঝগড়া করে। আমান রবিনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। ফলে তাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

চমক বা বিস্ময় (Surprise):

অপ্রত্যাশিত বস্তু, বাস্তবতা অথবা ঘটনা থেকে যে অনুভূতির জন্ম নেয়, তাই চমক বা বিস্ময়। বিস্ময়ের প্রকাশ দুইভাবেই হয়। কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখলে যেমন বিস্ময় প্রকাশ করি, তেমনি ভয়ংকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও বিস্ময় প্রকাশ করে থাকি। যেমন– কলিংবেলের শব্দ পেয়ে শায়লা দরজা খুলে দিলো। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে বসবাসরত ছোট মামাকে দেখে চমকে উঠে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর মামাকে জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। মামাও তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

ভালোবাসা (Love):

ভালোবাসা হলো মমতার ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক বন্ধনের বহিঃপ্রকাশ। মানবিকতা, সহানুভূতি আর মমত্ববোধের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। ভালোবাসা বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন– বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা, আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা, ধর্মের প্রতি ভালোবাসা, কোনো ব্যক্তি, বস্তু, খাদ্য, প্রকৃতি ইত্যাদির প্রতি ভালোবাসা।

লজ্জা (Shyness):

লজ্জাকে সাধারণত আবেগ বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লজ্জাকে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া, চেতনা, মানসিক অবস্থা বা দশা বলেও মনে করা হয়। পরিবেশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মানুষের লজ্জার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন হয়। লজ্জাকে নেতিবাচকভাবে না নিয়ে ইতিবাচক উপায়ে, নিজেকে লুকিয়ে না রেখে এর কার্যকর ও নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ করলে তা সুন্দর ব্যক্তিত্বের সোপান হয়ে উঠতে পারে।

অধিবেশন ২ - আবেগ ব্যবস্থাপনা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- আবেগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

রোল-প্লে/ভূমিকাভিনয়, আলোচনা, একক কাজ

ঘ) উপকরণ:

ব্ল্যাক বোর্ড এবং চক, রোল-প্লের জন্য ৪টি স্ক্রিপ্ট

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

এই অধিবেশন পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের অনুভূতির ব্যাপারে আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন– কেউ উত্ত্যক্ত হলে, কাউকে কালো, খোঁড়া বা খাটো ইত্যাদি বললে তারা বিব্রত হয় এবং অনুভূতিতে আঘাত লাগে। কখনো কখনো এই বিষয়গুলো কারো নামের সাথে জুড়ে দিয়ে ডাকা হয়। এই বিষয়গুলো একটি ছেলে বা মেয়ের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে অন্তরায়, তা তুলে ধরুন। শিক্ষার্থীদের যুক্তির মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে দৃঢ় প্রতিবাদ করার ব্যাপারে সচেতন করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

'আবেগ কী' এই অধিবেশনে পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৪টি দল তৈরি করুন। প্রতি দলে ৩/৪ জন করে শিক্ষার্থী থাকবে। প্রতি দলকে ১টি করে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর (আনন্দ, লজ্জা, ক্রোধ ও ভয়) আবেগ প্রকাশের লক্ষ্যে রোল-প্লের জন্য ৪টি স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে বলুন। প্রতি দল অভিনয়ের মাধ্যমে আনন্দ, লজ্জা, ক্রোধ আর ভয় এই আবেগগুলো তুলে ধরবে। অভিনয়ের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে ৩ মিনিট। রোল-প্লে চলার সময় যখন তারা একটি নির্দিষ্ট আবেগ প্রকাশ করবে, সেই মুহূর্তে তাদের 'স্ট্যাচু' বলে থামিয়ে দেবেন। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান এই অভিনয়ের মাধ্যমে কী প্রকাশ করা হয়েছে। রোল-প্লে শেষ হলে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা করুন। রোল প্লের মাধ্যমে কী কী আবেগ দেখানো হলো?

- আনন্দ বা সুখানুভূতি কী ধরনের আবেগ?
- রাগ বা ক্রোধ কী ধরনের আবেগ?
- কোন আবেগের প্রকাশ এবং অনুভব সহজসাধ্য?
- কোন কোন আবেগ সহজে প্রকাশ করা যায়?

প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য ৩.২.১ এর আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

এবার শিক্ষার্থীদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ১টি করে উপায় বলতে বলুন। শিক্ষার্থীরা যা বলেছে তা বোর্ডে লিখুন। সহায়ক তথ্য ৩.২.২ এর আলোকে ক্রোধ ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো বুঝিয়ে বলুন।

ছ) মূল্যায়ন:

ভূমিকাভিনয় ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কি না নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

শক্তি প্রয়োগ ছাড়া বা অন্যকে আঘাত না করে নিজের মনোভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারা এক ধরনের দক্ষতা। সুতরাং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা এবং নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখা জরুরি।

মূল বার্তা

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আবেগের যথাযথ প্রকাশ সুস্থ ও সুন্দর জীবন গঠনে সহায়ক।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

জেমস ডায়েরির ২৮-৩০ নম্বর পৃষ্ঠার 'আমিও লিখি তুমিও লেখো' অনুচ্ছেদটি এই সেশনের ফলো-আপ কার্যক্রম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষার্থীরা কী কী করতে পারে তা আলোচনা করতে বলুন এবং ডায়েরিতে লিখতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৩.২.১ আবেগ ব্যবস্থাপনা

আবেগ সহজাত বিষয় হলেও আবেগের প্রকাশ বিভিন্ন রকমের হয়। জীবনে আমরা নানাভাবে আবেগ প্রকাশ করতে শিখি এবং আমাদের সমাজে আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে জেন্ডারের প্রভাব রয়েছে। নবজাতক ছেলে বা মেয়ে যাই হোক কান্নার মাধ্যমে কয়েকটি আবেগ প্রকাশ করে– ভয়, রাগ ইত্যাদি। বড় হওয়ার সাথে সাথে ছেলেদের কান্না আর ভয় দমিয়ে রাখতে উৎসাহিত করা হয়। রাগ হলে সাহসী মনোভাব প্রদর্শনে তাদের বাধা দেয়া হয় না, যা কিনা মেয়েদের ক্ষেত্রে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মেয়েদের চুপচাপ থাকতে উৎসাহিত করা হয় এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে কান্না, ভয় আর বিষণ্নতার কোনো বিধিনিষেধ নেই। হয়রানির শিকার হলে রাগ প্রকাশ না করে মেয়েরা নিজেরাই লজ্জিত হবে– অনেকেই এ মত পোষণ করেন। এটা ঠিক নয়। মানুষ যেকোনো সময় আবেগী হতে পারে। যেকোনো অনুভূতি থেকেই আবেগ প্রকাশ পায়। সেটা সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি যেকোনোটাই হতে পারে।

আবেগ নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত সময় হতে পারে পরীক্ষার আগে, ফল প্রকাশের আগে অথবা খেলাধুলার সময় যখন শিক্ষার্থীরা একধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অবস্থায় আবর্তিত হয়। কারণ এ সময় শিক্ষার্থীরা ভয় আর দুশ্চিন্তার শিকার হয়। সাফল্য আর ব্যর্থতায় শিক্ষার্থীরা সুখী বা বিষণ্ন হয়। যে শিক্ষার্থীরা অন্তর্মুখী হওয়ার কারণে অন্যদের সাথে সহজে মিশতে পারে না, তাদের আবেগ প্রকাশ করতে পারে না তাকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত।

বিভিন্ন ধরনের আবেগের কথা আমরা জেনেছি। আবেগের যেমন বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে তেমনি আবেগ নিয়ন্ত্রণেরও বিভিন্ন উপায় রয়েছে। নিচে আমরা ক্রোধ/রাগ এর কারণ ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের উপায় জানবো।

৩.২.২ ক্রোধ/রাগ

ক্রোধ/রাগ একটি সহজাত আবেগ যার উৎপত্তি ঘটে কষ্ট, হতাশা, বিরক্তি ইত্যাদি থেকে। ক্রোধ প্রকাশের মাত্রা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করলে ক্রোধ/রাগ ক্ষতিকর হয় না।

ক্রোধের কারণসমূহ

- নিষ্ক্রিয় আচরণের ফলে;
- সামাজিক সমর্থনের অভাব;
- আবেগীয় বিশৃঙ্খলা- বিষণ্নতা, উদ্বেগ ইত্যাদি;
- মানসিক আঘাতজনিত ঘটনা;
- মানসিক চাপ;
- আঘাত/অপমান করে কথা বললে;
- হুমকির সম্মুখীন হলে;
- নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হয়ে হতাশ হওয়ার ফলে;
- অসম্মানিত হওয়ার ফলে;
- অধিকার খর্ব হলে।

ক্রোধ ব্যবস্থাপনা কৌশল

নিচের ধাপগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রোধকে প্রশমিত করা সম্ভব।

প্রতিক্রিয়া প্রকাশের আগে কিছুটা সময় নেওয়া

কারো ওপর রেগে গেলে তাৎক্ষণিক প্রকাশ না করে, কিছুটা সময় নিয়ে আগে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে তারপর ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলা উচিত।

১-১০ পর্যন্ত ধীরে ধীরে গুণতে থাকা

ধীরে ধীরে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে থাকলে মনোযোগ অন্যদিকে সরে যায়, ফলে রাগ কিছুটা কমে যায়। এভাবে কয়েকবার গুণতে হবে।

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের ৪টি ধাপ

কোনো কারণে রেগে গেলে এই পদ্ধতিতে তুমি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারো। প্রত্যেক ধাপে দু'টি প্রশ্ন থাকবে আর পরিস্থিতির সাপেক্ষে তোমাকে তার জবাব দিতে হবে। নিচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো:

তুমি বন্ধুর বাসায় যেতে চাও। তোমার খালা সপরিবারে বেড়াতে এলেন। তোমার মা বাড়িতে থেকে ঘরের কাজে তোমাকে সাহায্য করতে বললেন। তোমার ক্রমশ রাগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তোমার করণীয়:

১. সমস্যাটি চিহ্নিত করা (আত্ম-সচেতনতা)

নিজেকে প্রশ্ন করো:

আমার রাগের কারণ কী? আমি কী অনুভব করছি এবং কেন? এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত রাগান্বিত কারণ মা আমাকে বন্ধুর বাসায় যেতে নিষেধ করে বাড়িতে থেকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে বলেছেন। তোমার রাগ হচ্ছে কারণ তুমি বন্ধুর বাসায় যেতে পারোনি। প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে ভাবো: এই সময় ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের জন্য তোমার নিজেকে কিছু সময় দিতে হবে। কিছু করার পরিবর্তে এই সময়ে ভেবে দেখা যেতে পারে 'কী করা উচিত'।

আত্ম-জিজ্ঞাসা: আমি কী করতে পারি? অন্তত তিনটি বিকল্প ভাবতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ তুমি ভাবতে পারো:

১. আমি মায়ের কাছে অভিযোগ করতে পারি এবং নীরবে রাগের প্রকাশ ঘটাতে পারি।
২. মায়ের দেয়া কাজ শেষ করে বন্ধুর বাসায় যাওয়ার অনুমতি চাইতে পারি।
৩. মাকে সাহায্য না করার অজুহাত খুঁজতে পারি এবং যেকোনো উপায়ে বন্ধুর বাসায় যেতে পারি।

২. প্রত্যেক সমাধানের পরিণতি বিবেচনা করা (নিবিড় ভাবনা)

তোমার মাথায় আসা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার শেষ ফলাফল নিয়ে এ সময় চিন্তা করো।

আত্ম-জিজ্ঞাসা: প্রতিটি বিকল্পের পরিণতি কী?

উদাহরণস্বরূপ:

১. প্রত্যাখ্যান, অভিযোগ বা নীরবে রাগ প্রদর্শনের জন্য আরও বড় ঝামেলায় পড়তে পারো। এমনকি গৃহবন্দীও হতে পার।

২. মায়ের কাজে সাহায্য করলে একটা কাজের কাজ হবে এবং হয়তো দেরিতে হলেও বন্ধুর বাসায় যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। এমনকি এটা তোমার একটা বাড়তি গুণ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এই বিকল্পের মাধ্যমে তোমার মাও খুশি হবেন আবার তোমার বন্ধুর বাসায় যাওয়ার ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে।

৩. রাগের মাথায় বন্ধুর বাসায় চলে যাওয়াটা ভালো একটা বিকল্প মনে হতে পারে কিন্তু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে এর খারাপ দিকগুলো অনুধাবন করতে পারবে। তোমার এই কাজের জন্য তোমার মা অখুশি হবেন এবং তোমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করবেন। এছাড়া তোমার অনিয়ন্ত্রিত রাগের বহিঃপ্রকাশ তোমার বাবার কানেও পৌঁছাতে পারে।

৩) সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যেকোনো একটি বিকল্প বেছে নেওয়া

তিনটির মধ্যে কোনটি যথার্থ? পরিণামের কথা মাথায় রাখলে প্রশ্নের জবাব অবচেতন মনেই জানা হয়ে যাবে। নীরবে রাগ প্রকাশ করা বা বাড়ির কাজ না করে বন্ধুর বাসায় যাওয়া উভয় বিকল্পই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই বন্ধুর বাসায় যাওয়ার পরেও তুমি মানসিক শান্তি পাবে না এমনকি প্রশান্ত মনে বন্ধুর সাথে আলাপ করতে পারবে না। সুতরাং তোমার জন্য উপযুক্ত বিকল্পটি বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

৪) অগ্রগতি দেখা

ঘটনা বা কাজের শেষে কীভাবে সবকিছু সমাধান করলে তা নিয়ে কিছু সময় ভাবো।

আত্মজিজ্ঞাসা: আমি কেমন কাজ করেছি? সব কাজ কি আশানুরূপ হয়েছে? না হলে, কেন নয়? নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কি সন্তুষ্ট? ঘটনার পরিসমাপ্তিতে পিছন ফিরে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা তোমাকে নিজের সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা দেখার সুযোগ করে দেয়। তোমার সমাধান ভালো কাজে লাগলে আত্মতুষ্টি বোধ করতে পারো। যদি উপরের ৪টি ধাপ কাজের সমাধান না করে তবে ধাপগুলো নিয়ে আবার ভাবো, কেন তা কাজ করলো না। ক্রোধ বা বিষণ্নতা অনুভব করলে এগুলো করা সহজ নয়। কাজেই আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বারবার এই ধাপগুলো অনুশীলন করা আবশ্যক। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তোমার রাগ হলে এবং যখন তোমাকে পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়. তখন এই ৪টি ধাপ ভালো কাজ করে।

আবেগ সামলানোর আরও কিছু উপায়

শরীরচর্চা: হাঁটো, দৌড়াও, ব্যায়াম করো বা কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করো। অনেক গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয় যে, শরীরচর্চা মনের নেতিবাচক মনোভাব কমিয়ে মন প্রসন্ন করার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখে।

গান শোনা (অন্যদের বিরক্ত না করে): গান মানুষের মানসিকতা দ্রুত পরিবর্তনে সহায়ক। যদি তুমি গানের সাথে নাচো তাহলে একই সাথে শরীরচর্চাও হয় - একের ভিতর দুই। নিজের চিন্তা এবং আবেগ লিপিবদ্ধ করো। যেকোনো বক্তব্য অনেকভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। যেমন- ডায়েরি লেখা, গান বা কবিতা লেখা ইত্যাদি। লেখার পরে তুমি তা সংরক্ষণ করতে পারো অথবা ফেলে দিতে পারো তাতে কিছু আসে যায় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের চিন্তা-ভাবনা লিখে রাখলে তোমার মনোভাবের উন্নতি ঘটবে। নিজের ছোট ছোট আবেগ-অনুভূতি সঠিকভাবে বুঝতে পারলে আর খারাপ অনুভূতি দানা বাঁধতে পারে না।

ছবি আঁকা: নিজের চিন্তা-চেতনা ছবির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারাও মানুষের অনেক কাজে আসে।

যোগব্যায়াম: আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা যোগব্যায়াম সার্বিক মানসিক চাপ প্রশমনে একটি কার্যকর কৌশল, বিশেষ করে যখন তুমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যাও। নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলনে ক্রোধ জমা হতে পারে না। নিজের বিশ্বাসভাজনদের সাথে আলাপকালে বা রাগের মুহূর্তে অন্তরালে অনেক সময়ই ভয় অথবা বিষণ্নতার উপস্থিতি থাকে যা কিনা উপযুক্ত আলোচনার মাধ্যমেই প্রশমিত হতে পারে।

মনোযোগ: নিজের মনোযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করো। যখন কোনো বিষয়ে তোমার মনে প্রতিনিয়ত জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে তখন টিভি দেখা, বই পড়া অথবা সিনেমা দেখা তোমাকে এর থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করো। এতে একঘেয়েমি দূর হয়, মনের সজীবতা ফিরে আসে এবং সামাজিক মনোভাবের উন্নতি হয়। বড় পরিবেশে একে অপরের সাথে খাপ খাইয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করে সময়মতো চলতে অভ্যস্ত হয়। এতে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় এবং সর্বোপরি নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

মনোসামাজিক সহায়তা: মানুষ যখন কোনো কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তা থেকে উত্তরণের একটি উপায় হচ্ছে মনোসামাজিক সহায়তা। একজন প্রশিক্ষিত মনোসামাজিক সহায়তাকারী এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

অধিবেশন ৩- মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা এবং মনোসামাজিক সহায়তা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

কেস স্টাডি, প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

কেস স্টাডির ফটোকপি, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

মানসিক চাপ ও এর ব্যবস্থাপনার কৌশল এবং মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব যাতে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখবেন এবং এর জন্য সহায়ক তথ্য- ৩.৩.১, ৩.২.২ ও ৩.৩.৩ এর সাহায্য নিন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- শিক্ষার্থীদের ৬টি দলে ভাগ করুন এবং ৩টি দলকে কেস স্টাডি-১ ও অপর ৩টি দলকে কেস স্টাডি-২ মনে মনে পড়তে বলুন। যে ৩টি দল কেস স্টাডি-১ পড়েছে তাদের নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন।
  - পরীক্ষা-ভীতি দূর করতে শিমুল কী করতে পারে?
  - পরীক্ষায় খারাপ ফলের কারণে শিমুলের সাথে তার পরিবারের কী ধরনের আচরণ করা উচিত ছিল?
  - আশানুরূপ ফল না হওয়ায় শিমুলের উপর কী কী ধরনের মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে?
  - এরূপ পরিস্থিতিতে শিমুলের জন্য আর কী ধরনের সহযোগিতা দরকার?
- যে ৩টি দল কেস স্টাডি-২ পড়েছে তাদের নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন।
  - সুমি কেন বাসে উঠতে চায় না?
  - বাসে ওঠার প্রসঙ্গ এলে সুমির মধ্যে ভয়ের কী কী লক্ষণ দেখা দেয়?
  - কীভাবে সুমির জীবন স্বাভাবিক করা যায়?
- দলগত উপস্থাপনা শেষে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল ও মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য- ৩.৩.৩ এর সাহায্যে মনোসামাজিক সহায়তা কোথায় পাওয়া যায় তা জানিয়ে দিন।

ছ) মূল্যায়ন:

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন অর্জন যাচাই করুন। প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন।

সার-সংক্ষেপ:

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মনোসামাজিক সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মূল বার্তা

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির জন্য মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সহায়ক তথ্য

৩.৩.১ মানসিক চাপ ও এর কারণ

কেস স্টাডি: ১

শিমুল একজন মেধাবী শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রতিবারই পরীক্ষার আগে তার একরকম ভীতি কাজ করে। যদিও শ্রেণিতে বরাবরই সে প্রথম/দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আসছে। শিমুল ও তার পরিবার আশা করেছিল সে পিইসি পরীক্ষায় A+ পাবে। কিন্তু ফলাফলে দেখা গেল সে ৪.৮০ পেয়েছে। কাঙ্ক্ষিত ফল না হওয়ায় সে ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে ছিল। উপরন্তু তার পরিবারের সদস্যরাও তাকে সবসময় বকাঝকা করে এবং ভালো ফলকারী অন্যদের সাথে তুলনা করে দোষারোপ করে। ফলে সে পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, অল্পতেই রাগ করে, মনমরা হয়ে থাকে এবং একা থাকতে চায়।

কেস স্টাডি: ২

সুমি তার খালার সাথে বাসে করে যশোর থেকে খুলনা যাচ্ছিল। দ্রুতবেগে চলার কারণে একটি বাঁক ঘুরতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে খাদে পড়ে যায়। এতে কয়েকজন যাত্রীসহ সুমির খালার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে সুমির কিছুই হয়নি। কিন্তু চোখের সামনে ঘটা এ নির্মম দুর্ঘটনা সুমির মনে এতটাই প্রভাব ফেলে যে, পরবর্তী সময়ে বাসে উঠার প্রসঙ্গ আসলে ঐ দুর্ঘটনার দৃশ্য বার বার তার চোখে ভেসে ওঠে এবং তীব্র ভয় তাকে তাড়া করে। সে কখনই বাসে উঠতে পারে না।

মানসিক চাপ:

ব্যক্তির চাহিদা এবং ক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার ফলে ব্যক্তির নিজের মধ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে মানসিক চাপ বলা হয়। অর্থাৎ আমরা যে কাজটি যেভাবে করতে চাই তা যখন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে করতে পারি না, তখন আমাদের মানসিক চাপ হয়ে থাকে।

মানসিক চাপ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। যেমন–

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব: পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আবেগীয় বন্ধন সবচেয়ে দৃঢ়। তাদের সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি মতের আদান-প্রদান ঘটে। কখনো কখনো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতের অমিলের কারণে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এতে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়।
- পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতিগত, প্রথাগত ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৃষ্ট কলহ।
- শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে না পারা, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের বা ব্যবস্থাপনার অভাব, আর্থিক অসচ্ছলতা, সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব ইত্যাদি।
- কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপ কর্মবান্ধব ব্যবস্থাপনা বা পরিবেশের অভাব কর্মীদের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, যা তাদের কাজের গুণগত মান, উৎপাদনশীলতা, কাজের প্রতি আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি কমিয়ে দেয়।
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, যেমন– শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, যানজট, তীব্র আলো, কক্ষে অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ইত্যাদি।

মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা কৌশল

একজন ব্যক্তি যখন চাপের মুখোমুখি হন তখন তিনি চাপ মোকাবেলা করার জন্য কিছু চিন্তামূলক ও ব্যবহারিক কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে প্রশ্বাস ছাড়া;
- বাইরে হাঁটতে যাওয়া;
- বিশ্বস্ত বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় অতিবাহিত করা;
- বিশ্বস্ত কারো সাথে মনের কথা শেয়ার করা;
- পছন্দের বই পড়া, গান শোনা;
- ডায়েরি লেখা;
- ব্যায়াম করা;
- হাত-মুখ ধোওয়া বা গোসল করা;
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানো;
- প্রাকৃতিক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করা;
- প্রার্থনা করা।

৩.৩.২ পরীক্ষা- ভীতি

পরীক্ষা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ভয় বা চিন্তা সবার মনে বিরাজ করে যা পরীক্ষার জন্য দরকারি, তবে অতিরিক্ত ভয় শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণে এবং কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনের পথে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই ভয় শিক্ষার্থীদের জন্য এমন ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, পরীক্ষার কথা শুনলেই তার নানা রকম শারীরিক ও মানসিক উপসর্গ হতে থাকে।

পরীক্ষা-ভীতির শারীরিক, মানসিক উপসর্গ:

- বমি বমি ভাব হওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বমি হয়ে যাওয়া;
- খাওয়া-দাওয়া করতে না পারা;
- বুক ধড়ফড় করা;
- মাথা ঘুরানো, ভার ভার লাগা, ব্যথা করা;
- চোখে ঝাপসা দেখা;
- ঘুম না আসা;
- হঠাৎ করে হাত-পা খুব ঠাণ্ডা হয়ে আসা;
- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া;
- মূর্ছা যাওয়া;
- মনোযোগ দিতে না পারা;
- অল্পতে একাগ্রতা হারিয়ে ফেলা।

পরীক্ষা-ভীতি থেকে পরিত্রাণের উপায়

১. পরীক্ষা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা– পরীক্ষার নির্দিষ্ট তারিখ, সূচি, রুটিন, সিলেবাস অনুসারে প্রস্তুতি নেওয়া;
২. পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত কার্যকর অনুশীলনসহ লেখাপড়া করা;
৩. পরীক্ষা উপযোগী লেখাপড়া করা;
৪. বন্ধুদের সাথে দলগতভাবে লেখাপড়া করা;
৫. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা– পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি;
৬. মনোভাব উন্নতকরণ;
৭. দুশ্চিন্তা ও অমূলক ভীতি দূর করার কিছু পদ্ধতি যেমন– deep breathing ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৩.৩ মনোসামাজিক সহায়তা

মনোসামাজিক সহায়তা এমন এক ধরনের উপায় বা সহযোগিতা যা কিনা আকস্মিক বিপর্যয়, উৎপীড়ন-নিপীড়নের ফলে যে মানসিক বিপত্তির সৃষ্টি হয় তা থেকে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। এই সহায়তা মূলত তাদের জন্য যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক দিক থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করে। যারা মনোসামাজিক সেবা নিতে আসেন তাদের ক্লায়েন্ট বলা হয়। মনোসামাজিক সহায়তাকারী সাধারণত মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোসামাজিক কাউন্সেলরের কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। মনোসামাজিক সহায়তাকারী নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মনোসামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। শুধু ক্রোধ নিয়ন্ত্রণই নয়, সার্বিক আবেগ ব্যবস্থাপনায় মনোসামাজিক সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষিত মনোসামাজিক সহায়তাকারী তার ক্লায়েন্টের সমস্যা অনুধাবন, চিহ্নিতকরণ ও তার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন মানুষকে সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

মনোসামাজিক সহায়তার গুরুত্ব

ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক কোনো কারণে যখন কোনো ব্যক্তি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোধ করে, মানসিক চাপের মধ্যে থাকে, তখন তার কিছু শারীরিক, আচরণিক ও আবেগীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে, যেমন- বুক ধড়ফড় করা, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, ঘুম না হওয়া, খাবারে অরুচি, অমনোযোগিতা, হতাশা ইত্যাদি। কখনো কখনো এই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে মানুষ চরম বিষণ্নতায় ভোগে, এমনকি আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পরিবার, বন্ধু বা শিক্ষক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির মানসিকভাবে বিপর্যস্ততা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে শুধু পরিবার, বন্ধু বা শিক্ষকের সহযোগিতায় তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কষ্টকর। তখন অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত মনোসামাজিক সহায়তাকারীর শরণাপন্ন হতে হয়।

একজন মনোসামাজিক সহায়তাকারী সহায়তা সেবা দেয়ার সময় এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেন, 'সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করবেন'- মর্মে এমন বিশ্বস্ততা অর্জন করেন যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তি তার ভিতরে চেপে রাখা কষ্ট, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আচরণ কোনো কষ্টের সাথে জড়িত বিষয় অনায়াসে প্রকাশ করতে পারে। বার বার কাউন্সেলিং এর ফলে বিপর্যস্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনে ফিরে আসে, স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত হয় এবং দক্ষতার সাথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম হয়।

আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, শুধু যারা মানসিক ভারসাম্যহীন তারাই মনোসামাজিক সহায়তাকারীর শরণাপন্ন হয়। বিষয়টি তা নয়। ছোট বা বড় যেকোনো মানসিক চাপ যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মনোসামাজিক সহায়তাকারীর সাহায্য নেওয়া যায়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানে উল্লেখযোগ্য:

- এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতাল
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- জাতীয় ট্রমা সেন্টার
- মানসিক হাসপাতাল, পাবনা
- কাউন্সেলিং অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার, ঢাকা কলেজ
- ওসিসি (ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার)
- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার
- মহিলা সহায়তা কেন্দ্র
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র
- শিশু হেল্পলাইন- ১০৯৮
- কান পেতে রই
- অপরাজেয় বাংলাদেশ
- ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ষ-১ (এক) মডিউল-৪

সহিংসতা

৪.ক. উদ্দেশ্য

সহিংসতা এবং সহিংসতা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি ও সচেতন করা।

৪.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সহিংসতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন সহিংসতা চিহ্নিত করতে পারবে;
- সহিংসতার ধরন হিসেবে লেবেলিং ও অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- নিজেকে ও অন্যকে সম্মান প্রর্দশন করতে পারবে;
- সহিংসতা প্রতিরোধের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে;
- সহিংসতা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবে;
- সক্রিয়ভাবে সহিংসতা প্রতিরোধকারী হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে;
- সহিংসতার শিকার ও সহিংসতাকারী চিহ্নিত করতে পারবে;
- সহিংসতা মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

৪.গ. অধিবেশনসমূহ

- সহিংসতার ধারণা
- কিশোর-কিশোরীদের প্রতি ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য সহিংসতাসমূহ ও এর প্রভাব
- সহিংসতা থেকে উত্তরণ
- সহিংসতার প্রতি সম্মিলিত প্রতিবাদ

অধিবেশন ১ - সহিংসতার ধারণা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সহিংসতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা চিহ্নিত করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

ব্রেইনস্টর্মিং, জোড়ায় কাজ ও মুক্ত আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

চক, বোর্ড, ঘটনার কপি

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

এই সেশনটি সহিংসতা ও ক্ষমতা সম্পর্কিত। সহিংসতার বিভিন্নতা ও সুপ্ত রূপ চিনতে ছেলে-মেয়েদের সচেতন করা প্রয়োজন। সহায়কের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কোনো শিক্ষার্থীর জন্য কিছু বিষয় মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। এমন শিক্ষার্থীদের সাথে একান্তভাবে বসে আলোচনা করা প্রয়োজন। আপনার মতামত বা ধারণা জোর করে শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। এটার সত্যতা ও বাস্তবতা শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করতে হবে।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। 'সহিংসতা' শব্দটি বড় করে বোর্ডে লিখুন। প্রশ্ন করুন, শব্দটি শুনলে বা দেখলে তোমাদের মনে কী কী ধারণা আসে? চিন্তা করার জন্য দুই মিনিট সময় দিন।

- বোর্ডে শিক্ষার্থীদের মতামত লিপিবদ্ধ করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার পথে তাদের কখনো বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে কি না? তাদের মতামত শুনুন এবং ২/১টি গল্প বলে পরিবেশ সহজ করুন। বলুন, এসবই সহিংসতা। ধারণা স্পষ্ট না হলে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পয়েন্ট যোগ করুন।

- শারীরিক, মানসিক, যৌন ও আর্থিক সহিংসতার ধারণা সুস্পষ্ট করুন। প্রয়াজনে সহায়ক তথ্য-৪.১.১ এর সহায়তা নিন।

- এবার শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে বোর্ডে লিখিত পয়েন্টগুলোর মধ্য থেকে কোনগুলো শারীরিক, মানসিক, যৌন ও আর্থিক সহিংসতা তা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

- জোড়ায় লিখিত পয়েন্টগুলো পাঠ করে সহিংসতা ও সহিংসতার ধরন সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

- গল্পের মাধ্যমে সহিংসতার ঘটনা উল্লেখ করে এগুলো কোন ধরনের সহিংসতা তা বলতে বলুন (সহায়ক তথ্য - ৪.১.২)।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে এবং যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে হাইকোর্ট কর্তৃক ২০০৯ সালে একটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এই নীতিমালার মূল বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন (সহায়ক তথ্য- ৪.১.৩)।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিখন যাচাই করুন:

- সহিংসতা কী? সহিংসতা বলতে কী বুঝায়?
  (যেকোন ধরনের কাজ যা অন্যকে শারীরিক, মানসিক, যৌন এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেটিই সহিংসতা। কারো অধিকার খর্ব করাও এক ধরনের সহিংসতা)

- সহিংসতা কত ধরনের হতে পারে? (শারীরিক, যৌন, মানসিক ও আর্থিক)

সার-সংক্ষেপ:

যেকোনো ধরনের কাজ যার ফলে শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বা দুর্ভোগে পড়তে হয় তাই সহিংসতা। ব্যক্তিগত বা জনসমক্ষে হুমকি দেয়া; বল প্রয়োগ করা, স্বাধীনভাবে চলাফেরায় বাধা দেয়া ইত্যাদি সহিংসতা ।

মূল বার্তা

সহিংসতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, কোনো ধরনের সহিংসতাই গ্রহণযোগ্য নয়।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

জেমস ডায়েরির ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় 'সহিংসতা বলতে কী বোঝায়?' তা শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন এবং পরবর্তী সেশনে এ বিষয়ে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৪.১.১ সহিংসতা

কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে যদি শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অথনৈতিক নিপীড়নমূলক আচরণ করে তাই নির্যাতন বা সহিংসতা। এই সহিংসতা যেকোনো স্থানে হতে পারে, যেমন পরিবারে, স্কুলে, খেলার মাঠে, স্কুলে যাওয়া আসার পথে, স্কুলের ডরমেটরি/হোস্টেলে। একই পরিবারে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে যদি শারীরিক, মানসিক, যৌন, অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক আচরণ করে, তখন তাকে পারিবারিক সহিংসতা বলে। কিশোর-কিশোরী উভয়েই সহিংসতার শিকার হতে পারে আবার উভয়েই সহিংস হতে পারে। সহিংসতা পরিবারের কাছের ব্যক্তি দ্বারাও ঘটতে পারে আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ বা এলাকার মানুষের দ্বারাও ঘটতে পারে। সহিংসতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য উন্নয়ন ও বিকাশকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, উৎপীড়ন, বুলিং ইত্যাদিও সহিংসতার মধ্যে পড়ে।

বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা

শারীরিক

'শারীরিক নির্যাতন' অর্থে এমন কোনো কাজ বা আচরণ করা, যার দ্বারা কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাউকে অপরাধমূলক কাজ করতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন–

- মারধর করা;
- গলা টিপে ধরা;
- এসিড মারা;
- অগ্নিদগ্ধ করা/ঝলসে দেয়া;
- মাথার চুল কেটে দেয়া;
- চড়-থাপ্পড় মারা।

মানসিক:

কোনো ব্যক্তির ব্যাক্তিগত ইচ্ছা বা স্বাধীন মতামত প্রকাশে হস্তক্ষেপ করাই হল মানসিক নির্যাতন। যেমন–

- গালাগালি করা;
- খোঁটা দেয়া বা কটাক্ষ করা;
- অহেতুক সন্দেহ করা;
- চাকরিতে বা বাইরে যেতে না দেয়া;
- বাবা-মা বা পরিবার সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলা;
- তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা;
- অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা।

যৌন হয়রানি/নির্যাতন:

বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। অনেক সময় যৌন নির্যাতনের ফলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়–

- গায়ে হাত দেয়া বা দেয়ার চেষ্টা করা;
- যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;
- পোশাক ও শরীর নিয়ে মন্তব্য করা;

- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করা;
- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে কৌতুক বলা বা উপহাস করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;
- চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ বোর্ড, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার- টেবিল, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অপমানজনক কোনো কিছু লেখা;
- ব্ল্যাকমেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করা;
- যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;
- প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

আর্থিক সহিংসতা :

কিশোর-কিশোরী বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন–

- ভরণপোষণ না দেয়া;
- পড়াশোনার খরচ না দেয়া;
- টাকা দিয়ে খারাপ কাজ করানো;
- টাকার প্রলোভন দেখিয়ে বিপদজনক স্থানে নিয়ে যাওয়া;
- অর্থ উপার্জনের জন্য চাপ দেয়া।

৪.১.২ এটা কি সহিংসতা?

রনির গল্প

রনি ট্রেন-এ উত্ত্যক্ত করে মজা পায়।

রাজুর গল্প

রাজু মাঝে মাঝে তার চেয়ে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে ও তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে মজা পায়।

সুমন সাহেব তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসেন। তিনি তার যত্ন নেন। তাকে শপিং-এ, পার্কে ও মেলায় বেড়াতে নিয়ে যান।

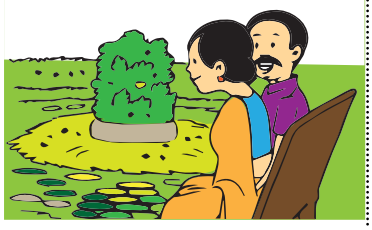

একদিন তার স্ত্রী ভুলবশত তরকারিতে লবণ বেশি দিয়ে ফেলেন। এতে সুমন সাহেব রেগে গিয়ে তাকে থাপ্পড় লাগিয়ে দেন।

একদিন দিশা গণিত খাতা নিয়ে তার শিক্ষকের কাছে গেল।

তুমি কষ্ট করে কেন স্কুলে আসো? তুমি আসলে লেখাপড়া করে কী করবে? তোমার দ্বারা পড়াশোনা হবে না।

-এটা কি সহিংসতা?

খাতায় ভুল দেখে তাঁর শিক্ষক মন্তব্য করলেন-

একটা মেয়ে স্থানীয় বাজারে হেঁটে যাচ্ছে। কয়েকটা ছেলে তাকে দেখে মন্তব্য করতে লাগলো ও সিনেমার গান গাওয়া শুরু করলো।

মেয়েটি ঘুরে তাদের দেখলো এবং চুপচাপ হেঁটে চলে গেলো।

-এটা কি সহিংসতা?

তখন তারা হাসিতে ফেটে পড়লো।

৪.১.৩ যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা

বাংলাদেশে ১৪ মে ২০০৯ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্ট কর্তৃক এই নীতিমালা প্রণীত হয়।

এই নীতিমালার বিশেষ দিক:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদের মর্মার্থ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ ও পালন করা বাধ্যতামূলক।

নীতিমালাটি কোথায় ব্যবহার করা যাবে?

- সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে।

নীতিমালাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;
- যৌন হয়রানির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- 'যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ'– এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

যৌন হয়রানিমুক্ত শিক্ষা পরিবেশ তৈরিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের করণীয়:

- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শ্রেণির কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে, যাতে কেউ পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ করতে পারেন।
- অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে পাঁচ (৫) সদস্য বিশিষ্ট একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করবেন, যার অধিকাংশ সদস্য হবেন নারী।
- যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটার সাধারণভাবে ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে হবে।
- অভিযোগ কমিটি ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন।

যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শাস্তি কী?

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (শিক্ষার্থী ব্যতীত) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে ক্লাস করা থেকে বিরত রাখতে পারেন।
- অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করবেন এবং সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- উক্ত অভিযোগ যদি দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট আদালতে পাঠিয়ে দিবেন।

অধিবেশন -২: কিশোর-কিশোরীদের প্রতি ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য সহিংসতাসমূহ ও এর প্রভাব

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সহিংসতার ধরন হিসেবে লেবেলিং ও অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

খেলা, গল্প বলা, মুক্ত আলোচনা, একক ও দলগত কাজ

ঘ) উপকরণ:

বিভিন্ন নামের লেবেলিং (যেমন; লম্বু, ভোটকু, গাধা, হাবা ইত্যাদি) বড় করে কাগজে লেখা, সেফটি পিন

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

এটি খুব সংবেদনশীল সেশন। এই সেশনে একটি খেলা আছে, খেলার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বাছাই করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করে বলুন যে, এটা শুধু একটি ভূমিকাভিনয়। অভিনয় করতে ইচ্ছুক এমন শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

পর্ব-ক

- শিক্ষার্থীদের সহায়ক তথ্য ৪.২.১ থেকে 'রেখার গল্প' শোনান এবং তাদের বলুন, রেখাকে যে 'আউলা বাউল' বলা হয়েছে এ ধরনের নামকরণকে কী বলে? তাদের মতামত ও সহায়ক তথ্যের সাহায্যে লেবেলিং বা খেতাব সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।
- লেবেলিং সম্পর্কে শিক্ষার্থীদর ধারণা দৃঢ় করার জন্য চারজন শিক্ষার্থীর পেছনে কাগজে লেখা লেবেল (যেমন ; লম্বু, ভোটকু, গাধা, হাবা ইত্যাদি) লাগিয়ে দিন যাতে তারা দেখতে না পায়।
- এবার অভিনয় করতে ইচ্ছুক চারজন শিক্ষার্থীকে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- এবার লেবেল লাগানো শিক্ষার্থীর সামনে লেবেলিং-এ যা লেখা আছে সে অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থী (যার লেবেলিং নেই) অভিনয় করে দেখাবে।

- অভিনয় করার জন্য সে এক মিনিট সময় পাবে এবং কোনো কথা বলতে পারবে না।
- অভিনয় দেখে শিক্ষার্থীকে বলতে হবে তার পিছনে আটকানো লেবেলটা কী?
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (১০ মিনিট) খেলা শেষ করুন।
- খেলা শেষে নিচের প্রশ্ন করুন:
  - লেবেলিং পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনুভূতি কেমন ছিল? (সংবেদনশীলতার সাথে উত্তরগুলো নিন, লেবেলিং পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করুন)
  - আমাদের সহপাঠী, বন্ধুরা বা বড় শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা আমাদের এই নামে ডাকে কিনা?
  - আমাদের কেউ এরকম নামে ডাকলে আমাদের কেমন লাগে? (ভালো লেবেলিং/খেতাবে আমাদের ভালো লাগতে পারে কিন্তু মন্দ লেবেলিং আমাদের মানসিকভাবে আঘাত করে। জেন্ডারভিত্তিক উপাধি যেমন- 'মেয়েদের মতো ছিঁচকাঁদুনে' জাতীয় লেবেলিং মেয়েদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে)

পর্ব-খ

- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করুন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা আছে কিনা? তাদের মতামত শুনুন। প্রয়োজনে তথ্য অপব্যবহারের ফলে সংঘটিত সমসাময়িক কিছু ঘটনা শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করুন।
- আগের অধিবেশনে আলোচিত যৌন হয়রানি সম্পর্কে পুনরালোচনা করে নিন। পরবর্তীতে অনলাইন ভিত্তিক যৌন হয়রানির ধারণা সুস্পষ্ট করুন। বিভিন্ন প্রকার অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি ও তা থেকে কীভাবে সুরক্ষিত থাকা যায় তা আলোচনা করুন (সহায়ক তথ্য-৪.২.২)।
- শিক্ষার্থীদের দলে (৫/৬ জন) ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে একটি অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি ও তা থেকে সুরক্ষার উপায় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করতে বলুন।
- দলগত উপস্থাপনের সময় ফিডব্যাক দিন। আলোচনা শেষে নিচের প্রশ্ন করুন:
  - মেয়েদের কি ছেলেদের চেয়ে বেশি অনলাইনে যৌন হয়রানি করা হয়? কেন এবং কীভাবে হয়? (এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকুন)
  - আমাদের জীবনে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার কীভাবে সমাধান করতে পারি?

পর্ব- গ

আলোচনার জন্য তিনটি কাগজে নিচের পয়েন্ট তিনটি লিখুন:

- আমি সহিংসতার শিকার হয়েছি
- আমি সহিংসতা দেখেছি
- আমি সহিংসতা ঘটিয়েছি

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে কাগজের টুকরা দিন।
- তিনজনকে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লেখা তিনটি উক্তি পড়তে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা উক্তিগুলো বুঝতে পারলে প্রত্যেককে ২ মিনিট ভাবতে বলুন।
- তাদের ভাবনাগুলো কাগজে লিখতে বলুন।
- ভাবনাগুলো লেখার পর নিচের প্রশ্ন করুন:
  - আমরা যখন সহিংসতা ঘটাই তখন আমাদের কেমন লাগে?
    (সম্ভাব্য উত্তর- সেই মুহূর্তে হয়তো খুব ক্ষমতাধর মনে হয়; কিন্তু পরে এর একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়)

- আমরা যখন সহিংসতা দেখি তখন আমাদের কেমন লাগে? (মাঝে মাঝে আতঙ্কিত ও হতাশ হই– যখন আমাদের কিছুই করার থাকে না। আবার এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ হই। এটা নির্ভর করে আমরা কীভাবে ভাবতে শিখেছি তার উপর)

- আমরা যখন সহিংসতার শিকার হই তখন আমাদের কেমন লাগে? কিশোর কিশোরীরা কী ধরনের সহিংসতার শিকার হয়? (সহিংসতা বিষয়ক নোটের সাহায্য নিন)

- তুমি কি কখনও কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছ? কীভাবে? (হয়ে থাকলে কখনও কখনও নীরবে বা ভয়ে বা লজ্জায় সহ্য করেছি। কীভাবে এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে)

- তুমি কি মনে করো যে, যার ক্ষমতা আছে সে-ই অন্যের উপর সহিংসতা ঘটাতে পারে? সমাজে কারা বেশিরভাগ সহিংসতার সম্মুখীন হয় এবং কেন? (উদাহরণস্বরূপ উপরের ক্লাসের ছাত্র নিচের ক্লাসের ছাত্রের উপর, শিক্ষক ছাত্রের উপর বা ছেলেরা মেয়েদের উপর সহিংসতা করে থাকে)

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন- জীবনের যেকোনো পর্যায়েই যে কেউ সহিংসতার শিকার হতে পারে।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিখন অর্জন যাচাই করুন:

- লেবেলিং আমাদের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
- দৈনন্দিন জীবনে আমরা কীভাবে অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকি?

সার-সংক্ষেপ:

কিশোর-কিশোরীদের প্রতি ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য সহিংসতাসমূহ তাদের জীবনে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। যা একজন শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং উন্নয়ন ও বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। কোনো কোনো সময় আমরা নিজেরাই সহিংসতার শিকার হই আবার কখনো নিজেরাই সহিংসতা করি। আমাদের অবশ্যই একে প্রতিরোধ করতে হবে।

মূল বার্তা

সহিংসতার বিষয়ে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে কিশোর-কিশোরীদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

জেমস ডায়েরির ৩৪-৩৬ নম্বর পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা পর্যবেক্ষণ করতে ও তা নিরসনের কোনো ব্যবস্থা নিয়ে থাকলে তা শেয়ার করতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৪.২.১ লেবেলিং বা খেতাব দেয়া:

লেবেলিং বা খেতাব দেয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার এক ধরনের সহিংসতা যা কিশোর-কিশোরীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, একটা মোটা/স্বাস্থ্যবান শিশুকে 'ভোটকু' অথবা পাতলা শিশুকে 'তালপাতার সেপাই' বলে ডাকা হয়। শিক্ষকগণও কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বুদ্ধিমান বা প্রতিভাবান বলে অভিহিত করতে পারেন, আবার যারা ভালো নম্বর পায় না তাদের 'ডাল/বোকা' বলে আখ্যা দিতে পারেন। লেবেলিং সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরে যা একজন ছাত্র/ছাত্রীর আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং উন্নয়নে বাধা দেয়। যেমন- নাম বিকৃতি করে ডাকা (কাশেমকে কাইস্যা বলে ডাকা)।

রেখার গল্প:

রেখা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। একদিন স্কুল থেকে ফিরে রেখা তার মাকে বলল কিছু মেয়ে আছে যারা তাকে তার ঘন এবং কোঁকড়া চুলের জন্য ঠাট্টা করে। তারা তাকে 'আউলা বাউল' বলে ডাকে। এ কারণে সে স্কুলে যেতে চায় না এবং শ্রেণিকক্ষে যেতে অস্বস্তি বোধ করে। একদিন তার বড় বোনের বান্ধবী হেমার সাথে রেখার দেখা হলো, যে একটি পাঁচতারা হোটেলে কাজ করে। হেমা রেখাকে বলল যে তার সবসময়ের ইচ্ছা তার চুল যদি রেখার মতো সুন্দর ও কোঁকড়া হতো। হেমা তাকে শিখিয়ে দিল কীভাবে সে তার চুলের যত্ন নেবে। হেমার কথায় রেখা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল এবং হেমার সাথে কথা বলে রেখা ভালোবোধ করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সে শিখতে লাগলো কেমন করে মেয়েদের বিদ্রুপমূলক কথা অগ্রাহ্য করা যায় এবং নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে। কারণ সে বুঝতে পেরেছে পৃথিবীতে কেউই পরিপূর্ণ নয়। প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে নিজেকে এগিয়ে নিতে হবে।

৪.২.২ অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি:

অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি হলো মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কাউকে হয়রানি করা যেমন, যৌন বার্তা ও এ সম্পর্কিত গান (অডিও/ভিডিও) শেয়ার করা, অশ্লীল ফোন কল করা, অনলাইন সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর তথ্য, ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে হয়রানি করা ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানির প্রকার: (শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ উল্লেখ করা হলো)

- কুরুচিপূর্ণ এসএমএস/এমএমএস দেয়া;
- ডিফেমিং বা মর্যাদাহানি: কেউ যদি কারো ব্যক্তিগত সুনাম বা সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করার জন্য অনলাইনে কোনো কিছু প্রকাশ করে তবে তাকে ডিফেমিং বা মর্যাদাহানি বলে;
- যৌন উত্তেজক ছবি, ভিডিও, কার্টুন, কথা ইত্যাদি ট্যাগ করে প্রদর্শন করা বা শেয়ার করা;
- অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভ ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের যৌন উত্তেজক অঙ্গভঙ্গি ও কথার মাধ্যমে কাউকে হয়রানি করা;
- কারো ফেসবুক আইডি হ্যাক করা অথবা কারো ব্যক্তিগত ছবি আর কথোপকথন এডিট করে অশ্লীলভাবে অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া অথবা দেওয়ার হুমকি প্রদান করা অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি। পাশাপাশি তা ঠেকানোর জন্য তার বিনিময়ে যদি অর্থ দাবি করা হয়, সেক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে;
- সামাজিক মাধ্যমে ফেক আইডি খুলে জ্বালাতন করা;

- সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন ট্রল গ্রুপ বা পেজে ব্যক্তিগত ছবি ছড়িয়ে দেয়া;
- বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত মুহূর্তের ধারণ করা ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেয়া;
- ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে হুমকি প্রদান ও হয়রানি;
- কাউকে মারধর করে তার ভিডিও ধারণ করে তা অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়া;
- ছবি তুলে অশ্লীলভাবে এডিট করে ইন্টারনেট বা ফেসবুকে দেয়া;
- ফোনে বাজে কথা বলা বা উত্যক্ত করা;
- একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি বা দল বেঁধে একজনকে মোবাইলে হয়রানি করা।

অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানি থেকে বাঁচতে কী কী সতর্কতা নেওয়া উচিত:

- ব্যক্তিগত কোনো কিছু অনলাইনে আদান-প্রদান না করা;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাসওয়ার্ড কারো সাথে শেয়ার না করা;
- ব্যক্তিগত ডিভাইসকে সুরক্ষিত রাখা;
- নিজের বা পারিবারিক কোনো ছবি উন্মুক্তভাবে না দেয়া;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া;
- ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও গ্রহণ না করা এবং কেউ গ্রহণ করতে চাইলে তাতে বাধা প্রদান করা;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন আপত্তিকর গ্রুপে যুক্ত না হওয়া।

অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানির শিকার হলে আইনি পদক্ষেপ:

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ আছে। এর শাস্তি প্রথমবার সংঘটিত হলে, অনধিক তিন (৩) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ (৫) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন সংঘটিত হলে, অনধিক পাঁচ (৫) বছর কারাদণ্ড,বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।

এছাড়াও অনলাইনভিত্তিক যৌন হয়রানির শিকার হলে জাতীয় নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্প লাইন নম্বর ১০৯ এবং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯ এ ফোন করে তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়া যাবে। পরবর্তী সময়ে থানায় জিডি করতে হবে। থানায় জিডি হলে অতঃপর সাইবার ক্রাইম ইউনিটে প্রেরণ করা হবে। সেখানে আরেকটি আবেদন করার পর অভিযোগের উপর তথ্য যাচাই করে সাইবার ক্রাইম ইউনিট অ্যাকশনে যাবে এবং প্রয়োজনে মামলা হবে।

সাইবার বুলিং:

সাইবার বুলিং বা সাইবার হয়রানি বলতে বোঝায় কাউকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সহায়তায় বুলিং করা। কেউ যদি অনলাইনে কাউকে অহেতুক জ্বালাতন করে এবং সম্মানহানি করার চেষ্টা করে অথবা যে কোনো উপায়েই হোক অনলাইনে উত্যক্ত করে তা 'সাইবার বুলিং' হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এ সমস্যাটা খুব বাড়ছে। এটা হতে পারে মিথ্যা প্রচারণামূলক, হুমকি, যৌন হয়রানি করা– যার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে কারো ক্ষতি করা।

বাংলাদেশে ফেসবুক এখন সবার হাতের নাগালে। খুব কম খরচে ফেসবুক ব্যবহার করা যায় বলে বাংলাদেশে এটি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে সাইবার বুলিং দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক সময় নিজেদের অজান্তেই আমরা সাইবার বুলিং-এর শিকার হচ্ছি। অনেকেই জানেন না সাইবার বুলিং-এর শিকার কখন, কীভাবে হচ্ছেন এবং কখন আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। ফেসবুক ছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ (WhatsApp), ভাইবার (Viber), স্ন্যাপচ্যাট (Snapchat), ইমো (Imo), স্কাইপে (Skype), টুইটার (Twitter), ইনস্টাগ্রাম (Instagram) এর মাধ্যমে সাইবার বুলিং ঘটে থাকে।

সাইবার বুলিং-এর ফলে সৃষ্ট মানসিক প্রভাব:

হতাশা, উদ্বেগ, ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, অন্যদের থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা, আত্মহত্যার ঝুঁকি, নিজেকে একা ভাবা।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধের উপায়:

- অপরিচিত কারো সাথে অনলাইনে বন্ধুত্ব বা অন্য কোনো সম্পর্কে না জড়ানো;
- অপরিচিত কারো সাথে অনলাইনে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত বার্তা দেয়া থেকে বিরত থাকা;
- বিরক্তিকর ব্যক্তিকে ব্লক করে দেয়া;
- সাইবার বুলিং-এর শিকার হলে বিশ্বস্ত কাউকে জানানো;
- অন্যান্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো;
- সাইবার বুলিং প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানো।

অধিবেশন- ৩ সহিংসতা থেকে উত্তরণ

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সহিংসতা প্রতিরোধের উপায় ও সহিংসতা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারবে;
- নিজেকে ও অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

অভিজ্ঞতা বিনিময় ও মুক্ত আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

লাল ও কালো মার্কার কলম, হোয়াইট বোর্ড, শরীর ক্ষেত্রের চিত্র, শ্রেণিকক্ষের একটি খোলা জায়গা

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

পর্ব- ক

ছেলে ও মেয়েদের সাথে আলাদাভাবে সেশনটি পরিচালনা করুন। কারণ তারা একসাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নাও করতে পারে। তাদেরকে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহ দিন এবং বলুন যে, এগুলো আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এতে ভয় বা বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। শরীর বৃত্তের একটি চিত্র প্রদর্শন করুন এবং আলোচনার সময় নিজেকে ভালোবাসার গল্পটি শেয়ার করুন। উৎপীড়ন সম্পর্কে ধারণা দিন এবং উৎপীড়ন থেকে বাঁচার উপায় আলোচনা করুন। সহায়ক তথ্য ৪.৩.১ এর সাহায্যে ধারণা স্পষ্ট করুন।

পর্ব-খ

এই পর্যায়ে সহিংস পরিস্থিতিতে কীভাবে চলতে হয় এবং কারো প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়াতে হয় সে বিষয়ে বুঝতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করুন। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করুন, তারা কীভাবে একত্রে কাজ করতে পারে, সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হলে একে অন্যকে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারে, একে অন্যের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে পারে সে সম্পর্কে বলুন। কিশোর-কিশোরীদের প্রতি স্পর্শকাতর হোন, তাদের উপর জোর করে আপনার মতামত চাপিয়ে দিবেন না। এক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা হবে সহায়কের, যিনি শুধু পথগুলো দেখিয়ে দিবেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাদের।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- নিজেকে সম্মান করার পাশাপাশি অন্যকে সম্মান করতে হয় ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
- নিরাপদ বা অনিরাপদ স্পর্শ ব্যাখ্যা করুন।
- কোন কোন পরিবেশে কেউ একজন মেয়ে বা ছেলেকে খারাপভাবে বা অনিরাপদ স্পর্শ করতে পারে তার ধারণা দিন।
- কীভাবে নিজেকে অনিরাপদ স্পর্শ থেকে রক্ষা করতে পারবে তা জিজ্ঞাসা করুন।

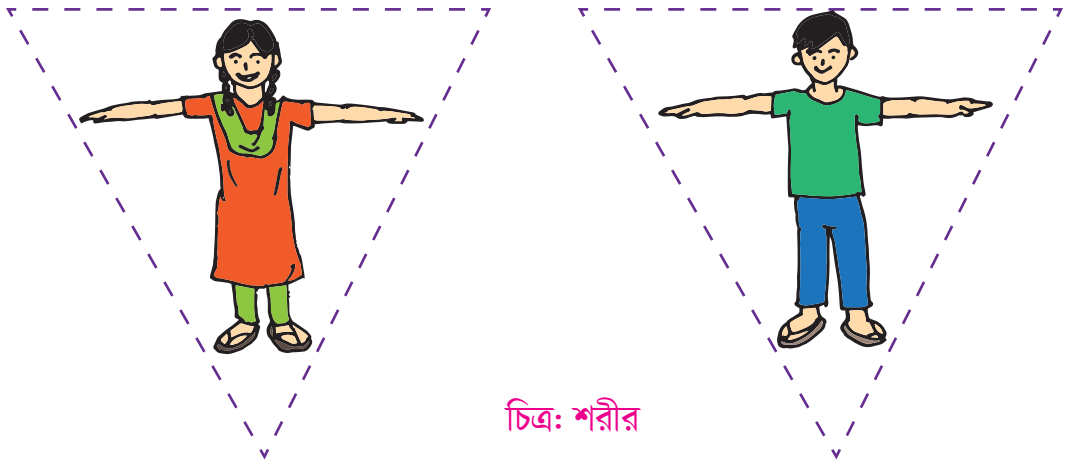

চিত্র: শরীর

চিত্রে যে ছবি দেখা যাচ্ছে– এটি হচ্ছে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব এলাকা। চিত্রের ছবি অনুযায়ী দুই দিকে হাত প্রসারিত করতে হবে। এবার হাত দু'টি দুই দিকে ঘোরালে একটি সীমানা তৈরি হবে। এই সীমানা হচ্ছে একান্তই তার নিজস্ব। এখানে বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন– সবাই নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সবারই মনে রাখতে হবে– তার শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন যাই হোক না কেন, এটাই তার জন্য উপযুক্ত। একে কখনও খাটো করে দেখা ঠিক নয়। সুতরাং তুমি নিজেকে সম্মান করবে এবং অন্যের প্রতিও সম্মান দেখাবে।

প্রশ্ন করুন:

- বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের কোন কথাগুলো তোমার খারাপ লাগে?
- কোন স্পর্শগুলো ভালো লাগে আর কোনগুলো খারাপ লাগে?
- অচেনা ব্যক্তির কোনো স্পর্শ খারাপ বা ভালো অনুভূত হলে তুমি কি তা বুঝতে পারো?
- কেউ যদি তোমার শরীরকে অসম্মান করে বা তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে তাহলে কীভাবে নিজেকে সুরক্ষা করবে?
- আমরা কীভাবে অন্যের শরীরকে অসম্মান করা থেকে বিরত থাকতে পারি?
- পাশাপাশি সমস্যায় পড়লে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে শেয়ার করার বিষয়টি আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে নিচের প্রশ্ন করুন:
    - তোমাদের মধ্যে কেউ নির্যাতনের শিকার হলে তাকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে?
    - অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে কোথায় যাবে?
    - কীভাবে নিজেকে সুরক্ষা করবে?

সহায়ক তথ্য ৪.৩.২ এবং ৪.৩.৩ এর সাহায্যে ধারণা স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন যাচাই করুন:

- সহিংসতার শিকার হলে তোমার করণীয় কী?
- অন্য কেউ সহিংসতার শিকার হলে কীভাবে তাকে সাহায্য করবে?
- সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হলে তোমাদের কোন কোন বিষয়ে সচেতন হতে হবে?

সার-সংক্ষেপ:

কারো সঙ্গে কেউ খারাপ আচরণ করলে, খারাপভাবে তাকালে, খারাপ স্পর্শ করলে, কটূক্তি করলে তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। ঠিক একইভাবে তোমার দ্বারা অনুরূপ আচরণ অন্যের অধিকারও ক্ষুণ্ন করে। পরিবারে বা অন্য কোনো সম্পর্কে দ্বন্দ্ব হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সহিংসতা এর কোনো সমাধান নয়।

মূল বার্তা

নিজেকে ও অন্যকে সম্মান করুন এবং সহিংসতাকে 'না' বলুন।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ৪০-৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় 'সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরাপদ থাকার পরামর্শ (টিপ্‌স) পড়তে বলুন এবং পরের সেশনে তাদের চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করার পরামর্শ দিন।

সহায়ক তথ্য

৪.৩.১ উৎপীড়ন

উৎপীড়ন একটা বড় সমস্যা। এটা ছোট শিশুদের মনে আঘাত করে, অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে, শিশুরা অসুস্থ হয়ে যায়, একাকীত্বে ভোগে, বিব্রত বোধ করে এবং নিরানন্দে ভোগে। উৎপীড়নকারীরা কখনো আঘাত করে, লাথি মারে, ধাক্কা মেরে মানুষের মনে আঘাত করে, নাম ডাকার সময় অন্য শব্দ ব্যবহার করে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, বিদ্রুপ করে অথবা আতঙ্কিত করে। একজন উৎপীড়নকারী অন্যের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারে, খপ করে শিশুদের কাপড় টেনে ধরতে পারে, কাউকে নিয়ে মজা করতে পারে অথবা কাউকে কোনো কারণে দল থেকে আলাদা করে রাখে।

কেন উৎপীড়নকারীরা এমন আচরণ করে?

কিছু উৎপীড়নকারী আছে তারা মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এমন আচরণ করে এবং মনে করে এমন আচরণ করলে অন্যের কাছে জনপ্রিয় হওয়া যায় অথবা সে যা চায় তা পেতে পারে। অধিকাংশ উৎপীড়নকারী নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যখন তারা নিজেদের অন্যের থেকে সরিয়ে নেয় এটা তাদের বড় এবং ক্ষমতাবান হিসেবে ভাবতে সহায়তা করে।

কিছু উৎপীড়নকারী এমন পরিবার থেকে আসে যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই রাগী এবং সবসময় উচ্চস্বরে কথা বলে। সবসময় রাগ রাগ ভাব, নাম ধরে ডাকা, চারদিকের মানুষকে ধাক্কা মারা ইত্যাদিকে তারা স্বাভাবিক আচরণ মনে করে।

অন্য কাউকে অনুকরণ করে উৎপীড়নকারীরা উৎপীড়ন করে। কেউ কেউ উৎপীড়নের শিকার হওয়ার কারণে অন্যকে উৎপীড়ন করতে পারে। কখনো কখনো উৎপীড়নকারীরা ভালো করে জানে সে যা করছে বা বলছে তা অন্যকে আঘাত করে। কিন্তু কিছু উৎপীড়নকারী প্রকৃতপক্ষে জানে না তার আচরণ দিয়ে অন্যরা কতটুকু আঘাত পাচ্ছে। অধিকাংশ উৎপীড়নকারী অন্যের ভালো লাগা বা মন্দ লাগাকে বোঝে না বা পাত্তা দেয় না। উৎপীড়নকারীরা এমন একজনকে ধরে যার থেকে সে ক্ষমতাবান বা যার সাথে ক্ষমতা চর্চা করা যাবে।

উৎপীড়নকারীদের থেকে দূরে থাকার ব্যবস্থা:

উৎপীড়নকারীদের কখনো সুযোগ দেয়া যাবে না। যতটা পারা যায় উৎপীড়নকারীদের এড়িয়ে চলতে হবে। কখনো তাদের জন্য শ্রেণিকক্ষ থেকে নিজেকে সরিয়ে বা এড়িয়ে চলবে না। যেটা করতে পারো সেটা হলো তারা যে পথে চলাচল করে সচেতনভাবে সে পথটা এড়িয়ে চলো। সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং নিজেকে সাহসী ভাবো। যখন তুমি অন্যদের সামনে ভয়ে থাকবে, তখন তুমি নিজেকে সাহসী ভাবতে পারবে না।

কিন্তু কিছু কিছু সময়ে নিজেকে সাহসী ভাব দেখালে উৎপীড়নকারীদের দমন করা যায়। একজন সাহসী মানুষ দেখতে কেমন এবং সে কীভাবে আচরণ করে? সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বল–'আমার সাথে ঝামেলা কোরো না'। এটা নিজেকে সাহসী ভাবতে অনেকটা সহজ করবে এবং নিজের সম্পর্কে স্বস্তিবোধ করতে সহায়তা করবে।

নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ করো:

পৃথিবীতে কেউই পরিপূর্ণ না। কিন্তু তোমাকে সবসময় সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজেকে সেভাবে ভাবতে হবে। এর জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যদি সর্বোৎকৃষ্ট হতে চাও তবে তোমাকে ভালো কিছু করার চর্চা করতে হবে। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে গোসল করে নিজেকে টিপটপ, ফিটফাট হয়ে যেতে হবে। যাতে নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। উৎপীড়নকারীদের এড়িয়ে চলার জন্য একা চলার চেয়ে দু'জন একসাথে চলা ভালো। উৎপীড়নের শিকার হওয়ার আশংকা থাকলে দুই-একজন বন্ধুর সাথে একত্রে চলাফেরা করতে পারো। তোমার বন্ধুদেরও এই পরামর্শ দিতে পারো। স্কুলে উৎপীড়নের ঘটনা দেখলে চুপ করে থেকো না– বড় কাউকে জানাও, যে উৎপীড়নের শিকার তার পাশে দাঁড়াও এবং উৎপীড়ককে থামতে বলো।

যদি উৎপীড়নকারী তোমাকে কোনো কিছু বলে অথবা কিছু করে:

উৎপীড়নকারীকে অগ্রাহ্য করো। উৎপীড়নকারীর দেয়া হুমকি যতটা পারো অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করো। এমন ভাব করো যেন তুমি তার কথা শুনছো না। দ্রুত পায়ে হেঁটে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নাও। উৎপীড়নকারীরা সবসময় তাদের কর্মকাণ্ডের বড় প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। তাই এমন ভাব দেখাও যে, এ নিয়ে তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই বা তুমি এটাকে আমলেই নিচ্ছ না। এতে উৎপীড়নকারীদের এই ধরনের আচরণ বন্ধ হতে পারে।

নিজের জন্য দাঁড়াও:

নিজেকে আত্মবিশ্বাসী এবং প্রকৃত সাহসী ভাবো। উৎপীড়নকারীকে বলো 'আর নয়, এবার থামো'। কথাটি উচ্চস্বরে বল। এরপর ঐ স্থান থেকে প্রয়োজনে নিরাপদ কোথাও চলে যাও। শিশুরা উৎপীড়নকারীদের ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ করা থেকে বিরত থাকার কথা বলে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারে এবং তারা একসাথে ঐ স্থান ত্যাগ করতে পারে। উৎপীড়নকারীরা যা বলে তোমার পছন্দ না হলে তুমি তা করো না এবং ঐ স্থান ত্যাগ করো। যদি তুমি তা করো তবে তারা তোমাকে উৎপীড়ন করতেই থাকবে। উৎপীড়নের প্রতিবাদে উৎপীড়ন করো না। তোমাকে বা তোমার বন্ধুকে কেউ উৎপীড়ন করলে তাকে পাল্টা আঘাত করো না। এটা করতে গিয়ে তুমি বিপদেরও সম্মুখীন হতে পারো। সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে নিজেকে নিরাপদ রাখা, বন্ধুরা একসাথে থাকা এবং বড়দের সাহায্য নেওয়া।

তোমার অনুভূতি প্রকাশ করো না:

আগে থেকে পরিকল্পনা করো। চিন্তা করো কীভাবে তুমি তোমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রেগে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে। নিজের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করো (১০০ থেকে উল্টো দিকে গণনা করো, শব্দ উল্টো দিকে বানান করো)। যতক্ষণ পর্যন্ত আবেগ নিয়ন্ত্রণে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদিকে মনোযোগ দাও। এমন কোথাও যাও যেখানে তুমি নিরাপদে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারো।

বড় কাউকে জানাও:

যদি তুমি কোনো ধরনের উৎপীড়নের শিকার হও, তবে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বড় কারোর সাথে বিষয়টি আলাপ করো। এমন কাউকে খুঁজে বের করো যাকে বিশ্বাস করা যায়, তার সান্নিধ্যে যাও এবং পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তার কাছে খুলে বলো। শিক্ষক, অধ্যক্ষ, মাতা-পিতা, বড় ভাইবোন উৎপীড়নকারীদের অত্যাচার থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারে।

৪.৩.২. নিজেকে সুরক্ষার উপায়

না বলো

নির্যাতন শুধু যে বাইরের মানুষ দ্বারা হয় তা নয়; বরং ঘরের মানুষ বা একেবারে নিকট আত্মীয় বা আপনজন দ্বারা যে হয় তা তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছো। কাজেই কেউ যদি তোমাকে কোনো কুপ্রস্তাব দেয় বা খারাপ কথা বলে অথবা গায়ে স্পর্শ করে অথবা এমন আচরণ করে যেটা তোমার ভালো লাগে না বা অস্বস্তি লাগে তবে সে যে-ই হোক না কেনো দৃঢ়ভাবে 'না' বলার অধিকার তোমার রয়েছে। তোমাদের বয়সের ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় না বলতে পারো না, মুখ বুজে সহ্য করে নিতে হয়; বিশেষ করে এ ধরনের আচরণ যখন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে আসে যা তোমার কাছে ভীষণভাবে অপ্রত্যাশিত তখন ভয়ে- লজ্জায়- আতঙ্কে এর প্রতিবাদ করা হয়ে উঠে না কিন্তু এখন থেকে মনে রাখতে হবে অপ্রত্যাশিত আচরণ যার কাছ থেকেই আসুক না কেনো, দৃঢ়ভাবে 'না' বলতে হবে, 'না' বলতে শিখতে হবে, 'না' বলতে পারার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

দূরত্ব বজায় রাখো

যারা নির্যাতনকারী তারা সুযোগ খোঁজে এবং যখন কোনো আড়াল পায় বা একা পায়, তখন সে সুযোগ কাজে লাগায়। কাজেই এমন যদি কখনো তোমার মনে হয় তবে তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে। কখনো একা তার মুখোমুখি না হয়ে বরং অনেক মানুষের মধ্যে থাকাই ভালো উপায়। একটা কথা মনে রাখা দরকার নির্যাতনকারীরও লোকলজ্জার ভয় আছে।

জোরে কথা বলো

জোরে কথা বলো এবং প্রয়োজনে চিৎকার দাও। নির্যাতনকারী যদি বোঝে তোমার উচ্চ কণ্ঠের কারণে অন্যরা জেনে ফেলবে তবে সে তোমাকে ঘাঁটানোর সাহস পাবে না। যারা জোরে কথা বলে বা ভোকাল, তাদের তুলনায় যারা মুখ বুজে থাকে বা ধীরস্থির, তাদের এসব বিপদ বেশি হতে পারে। কাজেই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে জোরে কথা বলো, প্রয়োজনে চিৎকার দাও অথবা কাউকে ডেকে সাহায্য চাইতে পারো।

তোমার শরীরকে জানো

শরীরের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে তোমার জানা প্রয়োজন। কোন স্পর্শ তোমার ভালো লাগছে, কোন্‌টাতে অস্বস্তি বা খারাপ লাগছে– সেগুলোকে চিহ্নিত করতে বা বুঝতে শিখতে হবে। তোমাকে এমনভাবে স্পর্শ বা আদর করার অধিকার কারো নেই যাতে তুমি অস্বস্তি বোধ করো।

উপহার গ্রহণে সতর্ক থাকো

মা-বাবাকে না জানিয়ে কারো কাছ থেকে কোনো উপহার যেমন; টাকা, ফুল বা মিষ্টি/চকলেট গ্রহণ করবে না, কারণ কখনো কেউ কেউ তার দুরভিসন্ধি পূরণ করার কৌশল হিসেবে তোমাকে উপহার দিতে আগ্রহী হতে পারে। সেজন্য সতর্ক থাকো এবং সেরকম মনে হলে বিশ্বাসী কাউকে বলো।

কোনো কিছু লুকিয়ো না ও শেয়ার করো

তোমাকে কেউ কখনো নির্যাতন বা জোর করলে তা কখনো চেপে রেখো না। যখন কোনো শিশুর সঙ্গে কেউ অশোভন আচরণ করে সে কাউকে তা বলতে বারণ করে। কারণ সে নিজেকে বাঁচাতে চায়। যেমন– কেউ তোমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরতে পারে; কিন্তু যখন সে সেটা কাউকে বলতে নিষেধ করে তখন তোমার অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বড় কাউকে (যেমন: পিতা-মাতা, শিক্ষক, বড় ভাই-বোন) জানানো প্রয়োজন।

এখানে তোমার ভয় বা লজ্জার কিছু নেই। এটাতে তোমার কোনো দোষ নেই। তোমার একান্ত কাছের বড় কারো দ্বারা তোমার প্রতি অসদাচরণ ঘটে থাকলে সেটা বলো। যদি বলতে জড়তা লাগে তবে লিখে তাদের জানাতে পারো। যদি বাবা-মাকে জানাতে সমস্যা হয় তবে শিক্ষককে বলো, তাতেও সমস্যা হলে অন্তত এমন কাউকে বিষয়টি জানাও যাকে বিশ্বাস করা যায়।

৪.৩.৩ সহিংসতার শিকার হলে সাহায্যকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

পরিবার: কেউ সহিংসতার শিকার হলে প্রথমেই বাবা-মাকে জানাবে। বাবা-মাকে জানাতে সংকোচ বোধ করলে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য বড় ভাই/বোন/নির্ভরযোগ্য কাউকে জানাতে হবে। পরিবারের সদস্যদের উচিত হবে সহিংসতার শিকার শিশু/শিক্ষার্থীর কথা মন দিয়ে শোনা এবং তাদেরকে অভয় দিয়ে সকল প্রকার মানসিক ও সামাজিক সহযোগিতা করা।

প্রতিবেশী: কোনো পরিবারের কোনো শিশু/শিক্ষার্থী সহিংসতার শিকার হলে এলাকার সকলকে অর্থাৎ নিকটতম প্রতিবেশীদের জানাতে হবে। প্রতিবেশীদের উচিত যে পরিবার সহিংসতার শিকার হয়েছে তাদেরকে সামাজিক ও আইনগত সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাদের পাশে থাকা।

শিক্ষক: পরিবারের পরই একজন শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাই সহিংসতার শিকার হলে শিক্ষককেও জানাতে পারে। শিক্ষক প্রয়োজনে অভিভাবকদের সহিংসতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানাবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার মনোসামাজিক (আত্মসচেতনতা, সহমর্মিতা) সহযোগিতা করবেন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

স্থানীয় সংগঠন: দলগতভাবে এলাকায় সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করবে। সহিংসতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে এলাকাবাসীকে জানাবে। সহিংসতা সৃষ্টিকারীকে চিহ্নিত করে তার মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে যাতে পুনরায় সে অন্য কারো ক্ষতি করতে না পারে।

ইউনিয়ন পরিষদ: সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এলাকায় পরিচালনা করবেন। সহিংসতা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা: সহিংসতার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করবেন। সহিংসতা প্রতিহত করতে দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গকে কঠোরভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করবেন।

পুলিশ: প্রয়োজনে পুলিশকে জানাবে। পুলিশ সহিংসতাকারীকে ধরবে ও শাস্তি দিতে সহযোগিতা করবে।

শিক্ষার্থী নিজে: শিক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে আত্মসচেতন হতে হবে। সহিংসতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পরিবারের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। এক্ষেত্রে সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত হেল্পলাইন (১০৯, ৯৯৯, ৩৩৩ এবং ১০৯৮) এর সহায়তা নিবে।

অধিবেশন -৪: সহিংসতার প্রতি সম্মিলিত প্রতিবাদ

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সহিংসতার শিকার ও সহিংসতাকারী চিহ্নিত করতে পারবে;
- সক্রিয়ভাবে সহিংসতা প্রতিরোধকারী হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে;
- সহিংসতা মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

গল্প বলা, দলগত কাজ

ঘ) উপকরণ:

গল্পের স্ক্রিপ্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

শিক্ষক নিশ্চিত করুন, যারা সহিংসতার শিকার হয় তারা যেন তাদের মনোবল দৃঢ় রাখে, নিজেকে অসহায় এবং অপরাধী মনে না করে। এধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে চুপ না থেকে শিক্ষাথীরা যেন সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করতে পারে, প্রয়োজনে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারে সে বিষয়ে দক্ষ করে তুলুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- সহায়ক তথ্য ৪.৪.১ এর সাবিনার গল্পটি শিক্ষার্থীদের শোনান। বোর্ডে লিখুন– সহিংসতা, অপরাধী, নির্দোষ, দর্শক এবং সহিংসতার শিকার। লটারির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বাছাই করে বোর্ডে উল্লেখিত বিষয়গুলোর সাথে গল্পের কোন কোন চরিত্র মিল আছে তা শনাক্ত করতে বলুন। শিক্ষাথীদের বলার পর নিচের প্রশ্নগুলো করুন:
  - তোমরা কি এই গল্পে সহিংসতা খুঁজে পেয়েছো?
  - কী কী ধরনের সহিংসতার অভিজ্ঞতা সাবিনার হয়েছে?
  - কারা অপরাধী?
  - কারা নীরব দর্শক? তারা কি কিছু করেছে? কেন? কেন নয়?
  - সাবিনা কি তার পরিস্থিতির জন্য দায়ী?
  - কে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারতো? কীভাবে?

- আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বলুন- সহিংসতার শিকার ব্যক্তিটি কোনোভাবেই দোষী নয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি নির্যাতনের শিকার হয় তাহলে নিজেকে দোষী ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং যারা এই ধরনের অপরাধ করে তারাই দোষী। এক্ষেত্রে সক্রিয় প্রতিরোধকারী সম্মিলিতভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এছাড়া সহিংসতার শিকার ব্যক্তির প্রতি সহমর্মী হতে হবে। এক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য ৪.৪.২ এর মাধ্যমে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

• এবার শিক্ষার্থীদের দলে (৫-৬ জনের) ভাগ করুন । প্রত্যেক দলকে এক একটি 'নির্যাতন' উল্লেখ করে দিন। যেমন-

- বিদ্যালয়ের আসা যাওয়ার পথে খারাপ উক্তি করলে
- কোনো সহপাঠী খারাপ কথা বললে
- কেউ শারীরিক নির্যাতন করলে
- কেউ খারাপ উদ্দেশ্যে গায়ে হাত দিলে
- মতের বিরুদ্ধে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিলে

• বলুন, এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে কীভাবে শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে সমস্যার সমাধান করবে। দলগত আলোচনার মাধ্যমে কৌশলগুলো পোস্টার পেপারে লিখতে ও উপস্থাপন করতে বলুন (১০মি.)। উপস্থাপনের সময় ফিডব্যাক দিন এবং সহায়ক তথ্য ৪.৪.৩ এর মাধ্যমে সহিংসতার সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করুন:

- কীভাবে সহিংসতার শিকার ও সহিংসতাকারী চিহ্নিত করতে পারবে?
- সহিংসতা মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রতিবাদ কীভাবে করবে?

সার-সংক্ষেপ:

যেকোনো সহিংস ঘটনায়, সহিংসতার শিকার এবং দোষী ব্যক্তিরা ছাড়া ঘটনার নীরব দর্শকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিশেষ করে যদি তারা ক্ষমতাবান হয়, যেমন উপর্যুক্ত গল্পের শিক্ষক। সময় মতো সম্মিলিত পদক্ষেপ সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে এবং এর প্রভাব হতে পারে চিরস্থায়ী। এই গল্পে সাবিনার শিক্ষক বা তার সহপাঠীরা হস্তক্ষেপ করতে পারতো তাহলে তার শিক্ষাজীবনের অকাল সমাপ্তি ঘটাতো না।

মূল বার্তা

সহিংসতার শিকার ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ৩৮-৩৯ নম্বর পৃষ্ঠার 'সহিংসতাকে না বলো' গল্পটি পড়তে বলুন। পড়ার পর তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, যদি তাদের জীবনে এরকম কোনো অভিজ্ঞতা থাকে যেখানে সম্মিলিত প্রতিবাদের দ্বারা কোনো সহিংস ঘটনার প্রতিরোধ হয়েছে, তবে তা ক্লাসের সবার সাথে আলোচনা করতে। জেমস ডায়েরির ৩৭ নম্বর পৃষ্ঠায় সহিংসতা বন্ধের জন্য তারা কী করতে পারে তা বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৪.৪.১ সাবিনার গল্প

সাবিনা ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে পড়াশোনায় ভালো ও মনোযোগী। সাকিব নামে তার এক সহপাঠী তার সাথে বন্ধুত্ব তৈরি এবং সময় কাটনোর বিষয়ে আগ্রহী ছিল। কিন্তু সাবিনা আগ্রহী ছিল না এবং সে তাকে তা জানিয়ে দিয়েছিল। তারপরও সাকিব তাকে বিরক্ত করতে থাকে। সে প্রায়ই ক্লাসে ফুল আর চিঠি সাবিনার দিকে ছুঁড়ে দিতো। এ বিষয়ে সাবিনা শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করলে উনি সাকিবকে মৃদু ধমক দেন এবং এমন কাজ করতে মানা করেন। কিন্তু সাকিব তা আমলে না নিয়ে সাবিনাকে বিরক্ত করতেই থাকে। এসব দেখে সাবিনার সহপাঠীরা তার সাথে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলো। সাবিনা অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়লো। এ সমস্ত কথা শুনে সাবিনার পরিবার তাকে বার্ষিক পরীক্ষার পর গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিল এবং সাবিনার শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

৪.৪.২ সহমর্মিতা

যার মাধ্যমে আমরা অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে তার জায়গা ও অবস্থান থেকে বুঝতে পারি এবং তার মতো করে অনুভব করতে পারি, সেই ক্ষমতাকে সহমর্মিতা বলে।

আমরা যেভাবে সহিংসতার শিকার ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি:

- আমি দুঃখিত যে তোমার সাথে এমনটা ঘটেছে
- এমন ঘটনা নিশ্চয়ই খুব দুঃখজনক
- আমরা তোমার পাশেই আছি

সহমর্মিতা প্রকাশের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার ব্যক্তির মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৪.৪.৩ তুমি যদি সক্রিয় সহিংসতা প্রতিরোধকারী হতে চাও:

- তুমি জানো কখন তোমাকে হস্তক্ষেপ/মধ্যস্থতা করতে হবে
- তোমার মধ্যস্থতা করার দক্ষতা আছে
- বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পন্থা তোমার জানা আছে
- তুমি জানো কীভাবে অন্য বন্ধুদের সম্পৃক্ত করতে হবে
- তোমার আত্মবিশ্বাস আছে
- কখন, কোথায় ও কীভাবে মধ্যস্থতা করতে হবে, সে বিষয়ে তোমার ভালো ধারণা আছে

সক্রিয় প্রতিরোধের অন্যতম অংশ হচ্ছে যখন সহিংসতার শিকার ব্যক্তি সহিংসতাকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারছেনা, তখন প্রতিবাদ করা। এতে সহিংসতার শিকার ব্যক্তি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সাহস পায় এবং সহিংসতাকারী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

বর্ষ-২ (দুই)

মডিউল - ১ জেন্ডার ৭৩-৮২
অধিবেশন ১ - জেন্ডার পুনরালোচনা
অধিবেশন ২ - সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা
অধিবেশন ৩ - নারী-পুরুষের অবস্থা-অবস্থান ও ক্ষমতা

মডিউল - ২ মাদকাসক্তি ও এইচআইভি/এইডস ৮৩-৯১
অধিবেশন ১ - মাদকাসক্তি ও মাদকমুক্ত থাকার কৌশল
অধিবেশন ২ - এইচআইভি/এইডস, অন্যান্য সংক্রমণ এবং এর প্রতিরোধ

মডিউল - ৩ সম্পর্ক ৯২-১০৫
অধিবেশন ১ - সুসম্পর্ক
অধিবেশন ২ - সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব
অধিবেশন ৩ - দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা

মডিউল - ৪ বাল্যবিবাহ ১০৬-১১৬
অধিবেশন ১ - বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফল
অধিবেশন ২ - বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীদের ভূমিকা

মডিউল - ৫ দৃঢ় প্রত্যয়ী যোগাযোগ ১১৭-১২৮
অধিবেশন ১ - কার্যকর যোগাযোগের ধারণা
অধিবেশন ২ - দ্বিধাহীন যোগাযোগ
অধিবেশন ৩ - সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক চাপ ও তা মোকাবিলা করার উপায়

বর্ষ-২ (দুই) মডিউল-১

জেন্ডার

১.ক. উদ্দেশ্য

নারী ও পুরুষের জীবনে সুযোগ, সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষমতা কীভাবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করা।

১.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে;
- নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে গড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- জেন্ডার ও ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ক্ষমতার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে;

১.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - জেন্ডার পুনরালোচনা
- অধিবেশন ২ - সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা
- অধিবেশন ৩ - নারী-পুরুষের অবস্থা-অবস্থান ও ক্ষমতা

অধিবেশন ১ - জেন্ডার পুনরালোচনা

প্রথম অধিবেশনে প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবেন এবং নিচের প্রশ্নগুলো পুনরালোচনা করবেন।

০১. জেন্ডার কী?

০২. জেন্ডার এবং সেক্সের পার্থক্য কী? ২টি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও ।

০৩. ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কী মিল রয়েছে?

০৪. ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কী?

০৫. সামাজিকভাবে জেন্ডার কীভাবে তৈরি?

০৬. মেয়েদের এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বল যেগুলো ছেলেদের সাথে মিল রয়েছে।

০৭. ছেলেদের কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মেয়েদের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে?

০৮. জেন্ডার বৈষম্য কী?

০৯. কে জেন্ডার বৈষম্য মোকাবিলা করে?

১০. কীভাবে জেন্ডার বৈষম্য বোঝা যায়?

১১. ছেলেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা ছেলেদের কাজ বলে গণ্য কাজগুলো কি মেয়েরা করতে পারে? উদাহরণ দাও।

১২. মেয়েদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা মেয়েদের কাজ হিসেবে গণ্য কাজগুলো কি ছেলেরা করতে পারে? উদাহরণ দাও।

অধিবেশন ২ - সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

খেলা

ঘ) উপকরণ:

চক, বোর্ড, মার্কার

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

খেলার প্রতিটি ধাপ ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পেরেছে তা নিশ্চিত করুন। যদি শিক্ষার্থীরা বক্তব্যের বিষয়টি ভালোভাবে না বোঝে তাহলে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের বলুন যে তারা একটি খেলায় অংশ নিতে যাচ্ছে। চার থেকে ছয়জনকে আসতে বলুন, যাদের মধ্যে দুই/তিনজন ছেলে এবং দুই/তিনজন মেয়ে। তাদের এক সারিতে এমনভাবে দাঁড় করান যাতে সবাই সবাইকে দেখতে পায়। নিচের বক্তব্য সব অংশগ্রহণকারীকে পড়ে শোনান।

খেলা শুরুর আগে শিক্ষার্থীদের বলুন:

"আমি তোমাদের সবাইকে কিছু পড়ে শোনাবো। যদি মনে করো ছেলে অথবা মেয়ে হওয়ার কারণে তোমরা একটি বিশেষ কাজ (যা আমি বলবো) করতে সক্ষম তাহলে এক পদক্ষেপ সামনে এসে দাঁড়াও। আর যদি মনে করো তা সম্ভব নয়, তাহলে নিজের জায়গায় থাকো। মনে রাখবে, তোমরা সব ছেলে এবং মেয়ের প্রতিনিধি। কাজেই যখন তোমরা বক্তব্যের বিষয়ে ভাববে তখন সকল ছেলে-মেয়ের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করবে।"

যখন বুঝতে পারবেন শিক্ষার্থীরা নির্দেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে তখনই খেলা শুরু করবেন। বাকি শিক্ষার্থীকে খেলা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।

খেলার সময় নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে শোনান

- সাধারণত কারা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকতে পারে?
- কাদের উত্ত্যক্ত করা হয় না?
- কারা ছুটির দিনে ঘুম থেকে দেরি করে উঠতে পারে?
- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও কাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেয়া হয়?
- কে দুই/তিন দিনের জন্য বনভোজনে যেতে পারে?

- কাকে রান্না করতে হয় না?
- কে তার চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে?
- কে জোরে হাসতে পারে?
- কে বাড়িতে জোরে কথা বলতে পারে?
- কে অধিক সময় মাঠে খেলাধুলা করতে পারে?

খেলা শেষে শিক্ষার্থীদের আলোচনার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করুন:

- তোমরা কী দেখেছ? কারা এগিয়ে? কেন?
- কারা পেছনে রয়ে গিয়েছে? কেন?
- কেন ছেলেরা বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়?
- মেয়েদের কি বেশি বিধি-নিষেধের মুখোমুখি হতে হয়? কেন?
- উপরে উল্লিখিত বিধি-নিষেধের বাইরে মেয়েদের আর কী ধরনের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হয়?
- বিদ্যালয়ের মেয়েদের জন্য কি কোনো বিধি-নিষেধ আছে?
- মেয়েদের বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আটকে রাখা কি উচিত? কেন? অথবা কেন নয়? এই বিধি-নিষেধ কমানোর জন্য আমাদের কী করণীয়?
- মেয়েরাও যদি সুবিধা পায়, তাহলে কী ঘটবে?

ছ) মূল্যায়ন:

ছেলে ও মেয়ে উভয়কে সমান সুযোগ দেয়া কেন প্রয়োজন তা প্রশ্ন করে শিখন অর্জন যাচাই করুন। এ ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য ১.২.১- এর সাহায্যে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

সার-সংক্ষেপ:

শুধু ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কারণে কারো প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়া উচিত নয়। সমান সুযোগ পেলে সকলেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে। আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থা থেকে অবদান রাখতে হবে। যাতে নারী-পুরুষ সকলেই পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

মূল বার্তা

সমান সুযোগ পেলে বিধি-নিষেধের বেড়াজাল অতিক্রম করে নারীরাও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের বলুন, জেমস ডায়েরির ২০ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি দু'টির অমিল খুঁজে বের করতে। এরপর ২১ নম্বর পৃষ্ঠার 'ভাবো ও লেখো' অনুচ্ছেদটি বাড়ি থেকে পূরণ করে নিয়ে আসতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

১.২.১ সুযোগ-সুবিধা এবং বাধাসমূহ:

এই অধিবেশনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে, আমাদের সমাজের বিভিন্ন আইন এবং নিয়ম-কানুন কীভাবে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধাগুলো তৈরি করেছে এবং সামাজিক বাধাসমূহ কীভাবে নারী-পুরুষের জন্য আলাদাভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে কোন নিয়ম-কানুনগুলো সুযোগ-সুবিধার জন্য তৈরি এবং কোনগুলো বাধা সৃষ্টি করছে এবং তখন তারা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং জেন্ডারের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য করতে পারবে।

পরিবারে একটি ছেলে শিশুর জন্ম বিশাল আনন্দ এবং উৎসবের মধ্যেমে উৎযাপন করা হয়। পুত্রসন্তান প্রাপ্তির জন্য পুরো পরিবার সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ধীরে ধীরে ছেলেটি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে বড় হয় এবং ভর্তি হয় একটি ভালো স্কুলে। তার লেখাপড়ার জন্য আলাদাভাবে শিক্ষকও দেয়া হয়। অন্যদিকে একটি মেয়ে শিশুর জন্ম বেশিরভাগ সময় আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করে না।

এখানেই শেষ নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পছন্দের ক্ষেত্রে এবং কোন বিষয়ের উপর পড়ালেখা করতে চায় সেখানেও ছেলেটির সাথে পার্থক্য করা হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মেয়ের চেয়ে একটি ছেলের জন্য টাকা খরচ করা বেশি শ্রেয় মনে করা হয়। একইভাবে মেয়েদের জন্যও খেলাধুলার কোনো সুযোগ নেই, অন্যদিকে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মেয়েদের খেলাধুলার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা হয়। কিন্তু ছেলেদের জন্য খেলাধুলা করতে কোনো বিধি-নিষেধ নেই এবং এটা তাদের অধিকার বলে প্রতীয়মান।

আমাদের সমাজের এই সংকীর্ণ চিন্তা এবং রক্ষণশীল মানসিকতাই জেন্ডার বৈষম্য তৈরি করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ অথবা সাহসিকতা প্রদর্শনের মতো কোনো কাজ করার জন্য নারীরা নিজেদের উপযুক্ত মনে করে না। এমনও হয় যে, একটি মেয়ে শুধু মেয়ে হওয়ার জন্য পিকনিকে যাওয়ার অনুমতি পায় না। পক্ষান্তরে একটি ছেলে পিকনিকে যাওয়ার অনুমতির জন্য নয়, পিকনিকের টাকার জন্য বাবার কাছে যায় এবং বাবা তা খুশি মনেই প্রদান করেন। এখনও অনেক পরিবারে মেয়েদের বলা হয় কীভাবে নিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়া করতে হয় তাকে তা শিখতে হবে, বাড়িতে পুরুষরা আগে খাওয়া-দাওয়া করবে পরে যা থাকে তা নারীরা খাবে।

একই পরিবারে নারী ও পুরুষ দু'জনে বাইরে কাজ করলেও দেখা যায় যে গৃহস্থালির কাজ এবং শিশু ও বৃদ্ধদের সেবা প্রদানের কাজটি নারীর কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজ প্রত্যাশা করে যে এসব কাজ নারীই করবে।

এবার আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তা করতে পারেন যে, কীভাবে সামাজিক নিয়ম-কানুন -গুলো ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা? একই নিয়ম যখন দু'জনের জন্য দু'রকম তা দেখে, আপনার অনুভূতি কী হয়? স্কুলেও কি এমন ভিন্নতা দেখা যায়? এটা আমরা সবাই জানি যে, স্কুলে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় কম। এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ, যেমন–

- কখনো কখনো ছাত্রীরা স্কুলে যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে;
- মেয়েদের শিক্ষার চেয়ে ছেলেদের শিক্ষার প্রতি পিতা-মাতার আগ্রহ;
- স্কুলে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য;
- মেয়েদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদার অভাব, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বেশি;
- নিম্নমানের স্যানিটেশন মেয়েদের স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত রাখে;
- স্কুলে এবং স্কুলে যাওয়া আসার পথে হয়রানি।

এবার ভেবে দেখুন আর কী কী কারণে একটি মেয়ে স্কুলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি ছেলের তুলনায় পিছিয়ে?

অধিবেশন ৩ - নারী-পুরুষের অবস্থা-অবস্থান ও ক্ষমতা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে গড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- জেন্ডার ও ক্ষমতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- ক্ষমতার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

ভূমিকাভিনয়, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

বোর্ড ও চক, চার্ট, স্কচটেপ/পিন, ভূমিকাভিনয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

ভূমিকাভিনয়ের বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন। প্রয়োজনে অনুশীলন করুন। সহায়ক তথ্য- ১.৩.১ অনুযায়ী ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ক্লাসটি শুরু করুন (আপনার দেখা জীবন-ঘনিষ্ঠ কোনো ঘটনাও বলতে পারেন)। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি স্পষ্ট করুন। নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানের মূল পার্থক্য তুলে ধরে একটি চার্ট তৈরি রাখুন। সহায়ক তথ্য হিসাবে অধিবেশন শেষে জেন্ডার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে, প্রয়োজনে সাহায্য নিন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

ভূমিকাভিনয় শেষে সহায়ক তথ্য ১.৩.২ অনুযায়ী সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানের ধারণাটি স্পষ্ট করুন। এবার পূর্বে প্রস্তুতকৃত চার্টটি (সহায়ক তথ্য- ১.৩.৩) দু'জন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে টানিয়ে দিতে বলুন।

ক্ষমতা ধারণাটি বোঝানোর জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝ থেকে ভূমিকাভিনয়ে আগ্রহী ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবীকে আহ্বান করুন। আটটি জোড়া তৈরি করুন এবং নিচের সম্পর্কগুলো অভিনয় করে দেখাতে বলুন।

- প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক
- শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক
- নারী শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিক
- মনিটর এবং শিক্ষার্থী
- একই শ্রেণির ছেলে শিক্ষার্থী এবং মেয়ে শিক্ষার্থী
- উচ্চ এবং নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থী
- মাতা এবং পিতা
- ভাই এবং বোন

প্রত্যেক জোড়াকে নিজ নিজ অভিনয়ের বিষয়ে পাঁচ মিনিট আলোচনার সুযোগ দিন। সবাই পালাক্রমে অভিনয় করবে। অভিনয় শেষে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা করুন এবং প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য- ১.৩.৪ এর সাহায্য নিন।

- ভূমিকাভিনয় সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী?
- এগুলোতে কি বাস্তবতার প্রতিফলন হয়েছে?
- তোমার অনুভূতি কী? কে ক্ষমতাধর? কে ক্ষমতাহীন? কেন?
- ক্ষমতা কী?
- ক্ষমতার উৎস কী?
- ভূমিকাভিনয়ের (রোল-প্লে) কোথায় ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে? ক্ষমতা ব্যবহারের এই কি একমাত্র পথ? তোমার কী ধারণা?
- ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের পন্থা কী কী?
- বাড়িতে কে ক্ষমতাবান?
- কর্মক্ষেত্রে কে ক্ষমতাবান?
- বিদ্যালয়ে কে ক্ষমতাবান?
- কে/কারা নিয়ন্ত্রক?
- কে/কারা নিয়ন্ত্রিত? কেন?

ছ) মূল্যায়ন:

সহায়ক তথ্য ১.৩.৩ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ে আরো কিছু প্রশ্ন করুন এবং উত্তর শুনুন। শিখনফল অর্জিত হলো কিনা তা নিশ্চিত হোন।

প্রত্যেক জোড়ার কাজ শেষে জেন্ডার ও ক্ষমতা এবং এর প্রভাব জানতে চান। প্রয়োজনে সহায়ক ১.৩.৪ এর সাহায্যে ফিডব্যাক প্রদান করে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।

সার-সংক্ষেপ:

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এমন কর্ম-পরিবেশ হবে যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই যোগ্যতা অনুযায়ী সকল কাজে তাদের অবস্থা ও অবস্থান নিশ্চিত করবে। ক্ষমতার ভালো-মন্দ নির্ভর করে ব্যবহারের উপর। সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারীরা কম ক্ষমতা ভোগ করে। সবক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হলে নারীরাও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

মূল বার্তা

কাজের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষদের অবস্থা ও অবস্থান নির্ধারিত হয়। ক্ষমতা সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ২২-২৩ নম্বর পৃষ্ঠার ছবি দু'টিতে সাইমন ও সায়মার প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায় খাতায় লিখতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

১.৩.১ ভূমিকাভিনয়:

চরিত্র: নারী ৩ জন, পুরুষ ২ জন

নারী -১: ধুর ছাই, আর ভাল্লাগেনা- প্রত্যেকদিন এতদূর থেকে পানি আনতে যে কি কষ্ট!

নারী - ২: হুম কোমর ভেঙে যায়রে...

নারী -৩: ইশ্ গ্রামে যদি একটি টিউবওয়েল থাকত।

পুরুষ-১: তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না, চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের গ্রামেই টিউবওয়েল দেবেন। আগামী সপ্তাহেই আমরা নিজেদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে পারব।

নারীরা : (সমস্বরে) খুব ভালো সংবাদ। আমাদের কষ্টের দিন শেষ হবে।

পুরুষ-২: আমরাও এখন থেকে কাজের ফাঁকে পানি সংগ্রহ করব, একসাথে সবাই কাজ করবো।

১.৩.২

শিক্ষক: তোমরা কী দেখলে? দেখলে যে, একগ্রামে খাবার পানির খুব সংকট ছিল। পাশের গ্রামের টিউবওয়েল থেকে নারীরা পানি সংগ্রহ করত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেই গ্রামে একটি টিউবওয়েল বসালেন। গ্রামের নারীরা তখন সহজেই সুপেয় পানি পেল। এতে গ্রামের নারীদের অবস্থার পরিবর্তন হলো, কারণ তাদের আর পানি আনতে দূরে যেতে হচ্ছে না। কিন্তু অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটল না, কেননা এখনও তাদেরকেই পানি আনতে যেতে হয়। যখন পুরুষরাও পানি সংগ্রহের কাজ করার জন্য এগিয়ে এলো তখনই নারীরা কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ পেলো, সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেলো এবং তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটল।

১.৩.৩: নারী- পুরুষের অবস্থা

নারী	পুরুষ
- সন্তান লালন-পালন, খাবার তৈরি, পানি ও জ্বালানি সংগ্রহ করে;	- সাধারণত সন্তান লালন-পালন, খাবার তৈরি করে না;
- উপার্জনের সুযোগ কম;	- প্রধানত আয়-উপার্জনের কাজ করে;
- সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম;	- সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে;
- রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম;	- রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বেশি;
- শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র সীমিত।	- জাতীয় অর্থনীতিতে মূল শ্রমশক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়।

নারী-পুরুষের অবস্থান

নারী	পুরুষ
- অর্থ-সম্পদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ কম;	- অর্থ সম্পদ ভোগ ও নিয়ন্ত্রণ বেশি;
- পছন্দ ও ইচ্ছার মূল্য কম;	- পছন্দ ও ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা ভোগ করে;
- আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ কম;	- আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বেশি;
- সমাজে নেতৃত্বের সুযোগ ও সহায়ক পরিবেশ অনুপস্থিত;	- সমাজে নেতৃত্বদান করে;
- রাজনীতিতে সহায়ক পরিবেশ অনেক কম।	- রাজনীতিতে অবাধ বিচরণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ বেশি।

১.৩.৪ জেন্ডার এবং ক্ষমতা, জেন্ডারে ক্ষমতার ভূমিকা

শিশুদের বুঝতে হবে ক্ষমতার অপব্যবহার কখনই ভালো না। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের সমাজ তৈরি। দেখা যায়, সমাজে অন্য সবার তুলনায় একজনই থাকে বেশি ক্ষমতাধর। সাধারণত এ ধরনের ক্ষমতা দেখা যায়, শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষের, শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে শিক্ষার্থীদের, ছোট ছেলে- মেয়েদের সাথে বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলে-মেয়েদের, ছেলেদের সাথে মেয়েদের, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কর্তৃপক্ষের। দুর্ভাগ্যবশত এ ধরনের সম্পর্কে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে দুর্বল ব্যক্তির কিছুই বলার থাকে না। এই কারণে দুর্বল ব্যক্তি নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত হয়। নির্যাতিতের আবেগ-অনুভূতি কখনোই কেউ বুঝতে চায় না। আমরা যদি এ সম্পর্কগুলো খুব ভালোভাবে লক্ষ করি তাহলে বুঝতে পারবো যে, কখনো কখনো আমরাও এই অপব্যবহারের শিকার আবার আমরাই কারো না কারো উপর এই ক্ষমতার অপব্যবহার করি এবং দুর্বলের উপর অবিচার করি। ক্ষমতার ব্যবহারে ভারসাম্য থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবেই আমরা পরিবার এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পারবো।

নিম্নের নানাবিধ ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার বর্ণনা দেয়া হলো:

পাওয়ার ওভার (Power over):

এর মাধ্যমে সাধারণত দমন, নিপীড়ন, দুর্নীতি অথবা বৈষম্যের মাধ্যমে তথা শক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই শক্তি কারো কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্যকে দাবিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করে এবং এর সুফল থেকে অন্যদের বঞ্চিত করে।

পাওয়ার উইথ (Power with):

এটি হলো সকলের সম্মিলিত শক্তির ক্ষমতা। এটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্যের ভিতর একটি ঐক্যের জায়গা খুঁজে বের করে এবং এর ভিত্তিতে একটি একক গন্তব্য নির্মাণ করে যা কিনা সকলের জন্য কল্যাণকর। ঐক্য, সংহতি এবং সমর্থনের ভিত্তিতে তৈরি এই শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নানামুখী প্রতিভা ও জ্ঞানের সম্মিলন ঘটায়।

পাওয়ার ফর (Power for):

এর অর্থ নিজের জীবনকে নিজেই প্রভাবিত করতে পারা। এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, ধারণা, জ্ঞান, উপকরণ এবং নিজেকে বোঝানোর সামর্থ্য থাকতে হবে। এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ই পাওয়ার ফর (Power for)।

ইন্টেরিয়র পাওয়ার (Interior power):

নিজেকে জানা আর আত্মমূল্যায়নের ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বলে মানুষ উন্নততর জীবনের স্বপ্ন দেখে আর পৃথিবীকে পরিবর্তনের আশা করে। এই ক্ষমতা দেয় স্বাধিকার, আত্মবিশ্বাস আর নিজের স্বকীয়তায় মূল্যায়িত হওয়ার অনুভূতি। পরিশেষে নারী এবং শিশুরা তাদের দেহ, মন, জীবন, স্বাস্থ্য, যৌনতা, পেশা আর সামাজিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে এবং আমাদের কখনই নারী এবং শিশুদের স্রেফ অন্য যে কোনো জড় পদার্থের মতো বিবেচনা করা উচিত নয়।

"শিক্ষক হিসেবে আপনি কী ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সাথে এই ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন?"

"কী ধরনের পরিস্থিতিতে আপনার শ্রেণিকক্ষে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে?"

"কীভাবে বিদ্যালয়ে যৌথ ক্ষমতা (Power with) গঠন এবং শক্তিশালী করা সম্ভব? কীভাবে এবং কী উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যায়?"

বর্ষ-২ (দুই) মডিউল-২

মাদকাসক্তি ও এইচআইভি/এইডস

২.ক. উদ্দেশ্য

মাদকাসক্তি ও এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

২.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবে;
- মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।
- এইচআইভি/এইডস কী, কীভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

২.খ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - মাদকাসক্তি ও মাদকমুক্ত থাকার কৌশল
- অধিবেশন ২ - এইচআইভি/এইডস, অন্যান্য সংক্রমণ এবং এর প্রতিরোধ

অধিবেশন ১ - মাদকাসক্তি ও মাদকমুক্ত থাকার কৌশল

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবে;
- মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

দলগত কাজ

ঘ) উপকরণ:

পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

মাদকাসক্তি ও এর কারণ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে এমন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করুন। তারা যাতে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- অধিবেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তাদের কাছে জানতে চান
  - মাদকাসক্তি বলতে তোমরা কী বোঝ?
  - কিশোর- কিশোরীদের মাদকাসক্তির লক্ষণ কী কী?
  - মাদকদ্রব্য গ্রহণের কুফল কী কী?
- শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। সহায়ক তথ্য ২.১.১ এর আলোকে তা স্পষ্ট করুন।

দলগত কাজ:

- শিক্ষার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে নিম্নোক্ত ৪টি দৃশ্যপট দিয়ে ১০ মিনিট আলোচনা করতে বলুন -

১. কয়েকজন সহপাঠী তোমাকে মাদক সেবনে চাপ দিচ্ছে। কীভাবে তুমি 'না' বলবে?

২. একজন ছেলে আরেকটি বন্ধুকে ধূমপান করতে দেখছে। কীভাবে সে তার বন্ধুকে ধূমপানে বাধা প্রদান করবে?

৩. তুমি তোমার প্রিয় বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গিয়ে দেখেছো আরও কয়েকজন মিলে ইয়াবা সেবন করছে। এই অবস্থায় তুমি কী করবে?

৪. তোমার ঘনিষ্ট বন্ধু মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। তাকে মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত রাখতে তুমি কী করতে পারো?

- প্রতিটি দলের কাছ থেকে তাদের উত্তরগুলো শুনুন এবং অন্যদেরকেও অংশগ্রহণ করতে বলুন।
- বোর্ডে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন এবং সহায়ক তথ্য ২.১.২ এর আলোকে ধারণাগুলো স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা দলগত কাজের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

যে কোনো মাদক নিঃসন্দেহে নিজের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের জন্য ক্ষতিকর। মাদক গ্রহণ না করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাদক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে বন্ধু-বান্ধবদের সচেতন করে তুলতে হবে।

মূল বার্তা

মাদকদ্রব্য সবসময়ই বর্জনীয়। কৌতূহলের বশেও মাদক গ্রহণ করা যাবে না।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ৪৮ ও ৪৯ নম্বর পৃষ্ঠায় ধূমপান সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি পড়ে ধূমপান বর্জনের উপায়গুলো ডায়েরিতে ৫১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখতে বলুন। এরপর তাদের জেমস ডায়েরির ৫২ ও ৫৩ নম্বর পৃষ্ঠার মাদকাসক্তি বিষয়ে গল্পটি এবং ৫৪ নম্বর পৃষ্ঠায় 'মাদক হতে বাঁচার উপায়' বাড়িতে পড়তে বলুন এবং পরের সেশনে তাদের চিন্তা-ভাবনা শেয়ার করার পরামর্শ দিন।

সহায়ক তথ্য

২.৩.১ মাদকাসক্তি

যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং আসক্তি জন্মে সেগুলোই মাদক দ্রব্য। মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে সরাসরি মস্তিষ্কে প্রভাব পড়ে এবং এর ফলে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণের নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। মাদক দ্রব্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে. যেমন- সিগারেট, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, গুল, অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ, হেরোইন, ইয়াবা ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির লক্ষণ:

- মেজাজ খিটখিটে হয়;
- ক্ষুধা ও রক্তচাপ কমে যায়;
- শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়;
- নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়;
- আচরণ আক্রমণাত্মক হয়ে যায়।

মাদকাসক্তির কুফল:

- মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে;
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে;
- শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়;
- কিছু কিছু মাদক শিরাপথে গ্রহণের ফলে এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- কার্যকর যোগাযোগের ক্ষমতা হ্রাস করে।
- কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, ফলে কর্মক্ষম জনশক্তি হ্রাস পায়।

২.৩.২ মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমবয়সীদের প্রভাব

অনেক সময় কিশোর- কিশোরীরা সমবয়সী ও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এবং কৌতূহলবশত মাদকাসক্ত হয়। এছাড়া হতাশা, দারিদ্র্য, ক্রমাগত কাজে ব্যর্থ হওয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা, মানসিক চাপ, রাগ, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সমস্যা, মাদককে জীবন উপভোগের জিনিস মনে করা- ইত্যাদি কারণেও মানুষ মাদকাসক্ত হতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এমন চিত্র দেখা যায়। মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমবয়সী, বন্ধু, সহপাঠী ও সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর- কিশোরীরা দিনের অধিকাংশ সময়ই স্কুলে এবং বন্ধু বা সঙ্গী-সাথীদের সাথে কাটায়। তাদের মধ্যে কেউ যদি মাদকাসক্ত হয়, তাহলে তার প্ররোচনায় বা নিজেরা কৌতূহলবশত মাদক সেবন করলে সে ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বন্ধু বা সঙ্গী-সাথীদের এ ধরনের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য আত্মসচেতনতা ও দৃঢ় মনোবলের প্রয়োজন।

মাদক গ্রহণের চাপ মোকাবিলা

মাদক গ্রহণের প্রস্তাব বা চাপ মোকাবিলা ও প্রত্যাখ্যানের উপায়–

- যেসব স্থানে মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, সেখানে না যাওয়া।
- যদি কোনো বন্ধু বা সহপাঠী কোনো ওষুধ বা ট্যাবলেট দিয়ে বলে, এটা খেলে বাড়তি শক্তি পাবে বা শরীর চাঙ্গা হবে, তা গ্রহণ করবে না। বন্ধুকে এসব দ্রব্যের খারাপ দিক সম্পর্কে জানিয়ে তাকেও এসব গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- স্কুলে বা পাড়া-মহল্লায় যারাই মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে, তাদের সাথে মেশা যাবে না।
- মানুষের জীবনে যেকোনো সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে, এসময় নিজের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অটুট রাখতে হবে। মাদকদ্রব্য সেবন কোনোভাবেই এর প্রতিকার নয়।
- বন্ধু-বান্ধব মিলে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলে নিজের মনে উদ্যম ও আনন্দের সঞ্চার করে এবং মাদকাসক্তি থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।
- গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

অধিবেশন ২ - এইচআইভি/এইডস, অন্যান্য সংক্রমণ এবং এর প্রতিরোধ

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- এইচআইভি/এইডস কী, কীভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- অন্যান্য সংক্রমণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

দলগত কাজ

ঘ) উপকরণ:

পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

সেশন শুরু করার আগে আলোচনা করুন যে, প্রজননতন্ত্রের মাধ্যমে যে সকল সংক্রমণ মানব দেহে বিস্তারলাভ করে, তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিরাপদ জীবন-যাপনের জন্য এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি। এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য সংক্রমণ বোঝাতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা বোঝে এমন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করুন। তারা যাতে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- অধিবেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তাদের কাছে জানতে চান
  - তারা কখনো এইচআইভি/এইডস এর কথা শুনেছে কি না?
  - শুনলে কী জেনেছে বা বুঝতে পেরেছে জানাতে বলুন।
- উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। সহায়ক তথ্য ২.২.১ এর আলোকে তা স্পষ্ট করুন।

দলগত কাজ:

- এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য সংক্রমণ কীভাবে সহজেই সামাজিক মহামারী হতে পারে তা বোঝানোর জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত হ্যান্ডশেক কার্যক্রমে অংশ নিতে বলুন:
- ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে কাগজ ভাঁজ করুন, এর মধ্যে একটি কাগজে `x′ (সংক্রমণ প্রতিনিধিত্ব করে) লিখুন এবং বাকিগুলো ফাঁকা রাখুন। সবাইকে একটি করে কাগজ নিতে বলুন।
- এবার শিক্ষার্থীদের পাঁচজন সহপাঠীর সাথে হাত মেলাতে বলুন। প্রতিবার হ্যান্ডশেক করে দু'জন শিক্ষার্থী একে অপরের কাগজে স্বাক্ষর করবে। সবার হাত মেলানো শেষ হলে তাদের নিজ আসনে বসতে বলুন।
- যে শিক্ষার্থীর নিজের কাগজে `x′ রয়েছে সে উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে স্বাক্ষরিত পাঁচটি নাম পড়বে।
- এরপর সেই কাগজে থাকা পাঁচজন শিক্ষার্থী উঠে দাঁড়াবে। সেই শিক্ষার্থীরা এখন সংক্রমিত হয়েছে (শেখার উদ্দেশ্যে)। তারা প্রত্যেকে তাদের কাগজে স্বাক্ষরিত পাঁচটি নাম পড়বে।

- এভাবে সমস্ত আক্রান্ত শিক্ষার্থী উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলতে থাকবে।
- এবার তাদের বুঝিয়ে বলুন যে কতো সহজেই মানুষ সংক্রমিত হতে পারে। সহায়ক তথ্য ২.২.২ এর সাহায্যে এইচআইভি/এইডস কীভাবে ছড়ায় তার ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এবার সহায়ক তথ্য ২.২.৩ এর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য সংক্রমণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে ধারণা দিন।
- এই কার্যক্রমটি সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করুন এবং শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যাতে বিব্রতবোধ না করে সেদিকে খেয়াল রাখুন। এই শেখার ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের এমন আচরণগুলো বুঝতে সাহায্য করা এবং সম্মান করা যা এইচআইভি/এইডস ও অন্যান্য সংক্রমণ রোধ করতে সহায়তা করে।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা দলগত কাজের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

ঘাতকব্যাধি এইচআইভি/এইডস বর্তমানে সারা বিশ্বে আশঙ্কাজনকভাবে বিস্তার লাভ করে চলেছে। এই রোগের কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। অকালমৃত্যুই এইডস রোগীর শেষ পরিণতি। তাই এইচআইভি ও এইডস কী, কীভাবে এ রোগ সংক্রমিত হয়, এ রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা কী, প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন।

মূল বার্তা

মরণব্যাধি এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে জানতে হবে। গড়তে হবে নিরাপদ ভবিষ্যৎ।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

এবার শিক্ষার্থীদের জেমস্ ডায়েরির ৪৬-৪৭ নম্বর পৃষ্ঠার এইচআইভি/এইডস বিষয়ে অনুচ্ছেদটি বাড়িতে পড়ে নিতে বলুন। তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিখে রাখতে বলুন এবং পরবর্তীতে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে উত্তর জেনে নিতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

২.২.১ এইচআইভি/এইডস কী?

এইচআইভি

এইচআইভি একটি ভাইরাস বা জীবাণু যার কারণে এইডস হয়। এর পুরো নাম হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। এই ভাইরাস মানবদেহের রক্তে প্রবেশের পর মানব দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করে এবং ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এক সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একদমই থাকে না ফলে অন্যান্য অনেক সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এইডস

এইডস (AIDS) মানে হলো Acquired Immuno Deficiency Syndrome। সহজ কথায় এটি হলো অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি। এটি আসলে কিছু রোগের উপসর্গ বা লক্ষণের সমষ্টি। এইডস হলো এমন একটি অবস্থা যখন এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের কারণে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

২.২.২ এইচআইভি/এইডস কীভাবে ছড়ায়?

এইচআইভি ভাইরাস সাধারণত মানবদেহের ভিতরে রক্ত, বীর্য, যোনিরস, মায়ের দুধের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়াতে পারে। এইচআইভি সুনির্দিষ্টভাবে যেভাবে ছড়ায়, তা হলো–

১. এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত কোনো ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে;
২. আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত সূঁচ/সিরিঞ্জ বা অন্যান্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কোনো ব্যক্তির শরীরে ব্যবহার করলে;
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অঙ্গ বা দেহকোষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে;
৪. আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভকালীন সময়ে, প্রসবকালে, মায়ের দুধ পান করার ফলে) শিশু এই রোগে সংক্রমিত হতে পারে;
৫. অনিরাপদ যেকোনো ধরনের দৈহিক মিলন ঘটলে;

এইচআইভি/এইডস কীভাবে ছড়ায় না

১. হাঁচি, কাশি, কফ-থুতু বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে;
২. একসাথে এক ঘরে বসবাস করলে, একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া-দাওয়া করলে;
৩. একসাথে খেলাধুলা বা একই ক্লাসে পড়াশোনা করলে;
৪. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে, কোলাকুলি করলে বা তার কাপড় ব্যবহার করলে;
৫. মশা বা কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে;
৬. আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে;
৭. একই বাথরুম ব্যবহার করলে বা একই পুকুর/জলাশয়ে গোসল করলে।

এইচআইভি আক্রান্ত কিনা, কীভাবে জানবে

কোন ব্যক্তি এইচআইভি আক্রান্ত কি-না তা জানার জন্য রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন। অনেক সরকারি হাসপাতাল ও এনজিও ক্লিনিকে বিনামূল্যে এই পরীক্ষা করানো হয়।

এইচআইভি/এইডস প্রতিকারের উপায়

দুর্ভাগ্যবশত এই মূহুর্তে এইচআইভি/এইডস প্রতিকারের কোনো চিকিৎসা নেই। কিছু ঔষধ আছে শুধু দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এটি দেহকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে করণীয়

১. সর্বদা পরীক্ষা করে রক্ত পরিসঞ্চালন করা;
২. একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ ব্যবহার করা;
৩. বিশ্বস্ত যৌনসঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক করা, কনডম ব্যবহার করা;
৪. অপারেশনে পরিশুদ্ধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
৫. চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এইচআইভি জীবাণুবাহী বা এইডসে আক্রান্ত মায়ের গর্ভধারণ করা।

এছাড়াও এইচআইভি সংক্রমণের কারণগুলো জেনে এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা এইডস্ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে পারি। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো-

১. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করা
২. আবেগ প্রশমন
৩. ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
৪. ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলা
৫. এইচ আইভি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

২.২.৩ প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ ও প্রতিরোধ

প্রজননতন্ত্রে যেকোনো সংক্রমণ বা রোগ দেখা দিলে তার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মূলত অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো সময় এসব সংক্রমণ অন্যভাবেও ছড়াতে পারে। গনোরিয়া, সিফিলিস, ক্ল্যামাইডিয়া, হার্পিস, এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস সি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণও রয়েছে। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হলে সাধারণত শরীরে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন-

- প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া হওয়া
- তলপেটে ব্যথা, কুঁচকি ফুলে যাওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর
- যৌনাঙ্গে বা যৌনাঙ্গের চারদিকে ও পায়ুপথের আশেপাশে ঘা বা চুলকানি হওয়া, ফুলে যাওয়া
- পুরুষাঙ্গ বা যোনিপথ থেকে পুঁজ, পুঁজের মতো বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব (পিচ্ছিল আঠালো তরল) বের হওয়া।

তবে মনে রাখতে হবে, প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হলেই যে সবসময় শরীরে লক্ষণ বা সমস্যা দেখা দেবে তা ঠিক নয়। প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের মাঝে এর কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এ কারণে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কোনো আচরণ করলে নিজে থেকেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করা ও প্রয়োজনে চিকিৎসা নেয়া উচিত। পরবর্তীতে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ যেন না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

বর্ষ-২ (দুই) মডিউল-৩

সম্পর্ক

৩.ক. উদ্দেশ্য

সম্পর্কের ধারণা, সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব জানা।

৩.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে;
- সুসম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারবে;
- পারস্পরিক সম্পর্কের প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- সম্পর্কের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেতন হবে;
- সম্মতির অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - সুসম্পর্ক
- অধিবেশন ২ - সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব
- অধিবেশন ৩ - দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা

অধিবেশন ১ - সুসম্পর্ক

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে;
- সুসম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

প্রশ্নোত্তর, আলোচনা এবং একক কাজ

ঘ) উপকরণ:

কাগজ, কলম ও স্কচ টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে মানুষ একা বসবাস করতে পারে না। সমাজে বসবাস করার সময় পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় তাদের কারও না কারও সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়, যেমন- পরিবারে মা বাবা, ভাই-বোনের সাথে, সমাজে প্রতিবেশীর সাথে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। কোনো সম্পর্কই মূল্যহীন নয়। প্রত্যেকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে উৎসাহিত করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। তাদের বলুন, আজ আমরা আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়ে কথা বলব। এটা এমন একটি বিষয় যাতে আমাদের কথা, কাজ এবং আচরণকে গুরুত্ব দিতে হয়। আমরা আমাদের বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করব।

একটি কাগজ নিন এবার আপনি কাগজটি ছিঁড়ে ফেলুন। এই কাজকে একটি ভুল হিসেবে উপস্থাপন করুন এবং বলুন যে এই কাগজটি আপনার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং আপনি ভুল করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তিন চারজন শিক্ষার্থীকে ডেকে বলুন স্কচ টেপ দিয়ে এই কাগজটি জোড়া দিতে।

এরপর সম্পর্কের উপর সেখানকার প্রভাবের সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের বলুন তাদের জীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তা করতে এবং এর ভিত্তিতে একটি মুক্ত তালিকা তৈরি করতে। এই তালিকায় মাতা-পিতা, প্রতিবেশী, বন্ধু প্রভৃতি সম্পর্কের নাম আসতে পারে। কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে তারা কী লিখেছে জানতে চান।

এরপর নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নাবলির ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করুন। সহায়ক তথ্য ৩.১.১ আপনার আলোচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

- কার সাথে তোমার সুসম্পর্ক আছে? এই সম্পর্কের কোন বিষয়গুলো তোমার প্রিয়, কোনগুলো অপ্রিয়? কেন?
- পরস্পরের বিষয়ে আমাদের অনুভূতি কী? (শিক্ষার্থীরা তাদের তালিকার যে কোনো একটি সম্পর্কের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারে)
- যখন তুমি ছোট ছিলে তখন কাকে/কাদেরকে কাছের মানুষ মনে হতো?
- সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমাদের কী করণীয়?
- আমি ক্লাসে প্রবেশের সময় একটি কাগজ টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। কয়েকজন শিক্ষার্থী আমাকে তা জোড়া লাগাতে সাহায্য করে। এই কাগজটি ছেঁড়া ও জোড়া দেয়ার সাথে একটি সম্পর্কের সাথে কি কোনো মিল আছে? সেই মিল কী?
- সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায় কী?

ছ) মূল্যায়ন:

বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ভিত্তি এবং সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের যে কাজ দেয়া হয়েছে এবং প্রশ্ন করা হয়েছে সেখানে কোনো ঘাটতি রয়েছে কি না নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে। কার্যকর সম্পর্ক রক্ষায় প্রয়োজন ধৈর্য, সহানুভূতি, যোগাযোগ, সম্মান আর বিশ্বাস। এগুলোর অভাবে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সবারই।

মূল বার্তা

সম্পর্ক তৈরি হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের জেমস ডায়েরির ২৭ নম্বর পৃষ্ঠার 'সম্পর্ক' অনুচ্ছেদের খেলাটি বুঝিয়ে দিন এবং বাড়িতে খেলতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৩.১.১ বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক

সম্পর্ক

গোটা সমাজ এক ধরনের সম্পর্কের জালে আবদ্ধ। আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে বেড়ে উঠি। শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এভাবে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় সম্পর্কের রূপান্তর ঘটে। সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ রয়েছে যেমন- পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সাধারণ সম্পর্ক (Casual) এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক। আমরা এখানে কয়েকটি সম্পর্ক সম্পর্কে জানবো।

পারিবারিক সম্পর্ক (Relationship)

আপনজনকে ভালোবাসা ও তার যত্ন নেওয়ার প্রথম শিক্ষা পরিবার থেকেই আমরা পাই। পরিবারের সদস্যরাই আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আবার কখনো কখনো পরিবারই সেই জায়গা যেখানে নারী ও মেয়ে শিশু বঞ্চনা ও বাধার শিকার হতে শুরু করে। নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাও আমরা অনেক সময় পরিবার থেকেই পাই। এমনকি এই পার্থক্য কখনো কখনো অনেক ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে শুরু হয়; যেমন– ছেলেকে ফুটবল আর মেয়েকে পুতুল কিনে দেয়া। আবার কখনো কখনো এই পার্থক্য অনেক বড় বিষয় নিয়েও হতে পারে; যেমন, ছেলের জন্য ভালো স্কুলে ভর্তির চেষ্টা করা আর মেয়েকে কাছাকাছি কোনো স্কুলে ভর্তি করে দেয়া।

যেহেতু নারী-পুরুষের সামাজিকীকরণ এবং বৈষম্যের প্রথম ধাপ পরিবারেই শুরু হয়, সেহেতু এই বৈষম্যের সমাধান পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। পরিবার হচ্ছে ব্যক্তির শক্তি ও সমর্থনের সবচেয়ে বড় উৎস। পারিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকলে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো যায়।

বন্ধুত্বের সম্পর্ক (Friendly Relationship)

সবারই বন্ধুর প্রয়োজন আছে। বন্ধু হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সঙ্গ আমরা পছন্দ করি, যাকে আমরা ভালো করে জানি, সম্মান আর বিশ্বাস করি এবং আন্তরিকভাবে অনুভব করি। বয়সের সাথে সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। মানুষের সাথে কথা বলা, মানুষকে জানা আর পারস্পরিক মিল খুঁজে বের করা, একে অন্যের উপর নির্ভর করা এইগুলোই বন্ধুত্বের ভিত্তি। বিদ্যালয় বা সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণই হচ্ছে নতুন বন্ধু তৈরির সবচেয়ে ভালো উপায়। মানুষকে সাহায্য করা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার আরেকটি সহজ উপায়। সঙ্গী-সাথীদের চাপ বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বিরূপ ভূমিকা পালন করে। কেউ যদি সাথীদের উপর চাপ তৈরি করে তাহলে সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে না। নিজের বিশ্বাসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরার অধিকার সবার রয়েছে। বন্ধুদের সামনে নিজের মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করা এবং কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে যুক্তি তুলে ধরতে হবে। আত্মবিশ্বাসহীন বা আত্মকেন্দ্রিক মানুষের জন্য বন্ধু তৈরি অথবা বন্ধুত্ব ধরে রাখা কঠিন।

যদি বন্ধুদের সাথে সম্পর্ককে সম্মান করা না হয় তাহলে এই সম্পর্ক টিকে থাকবে না। যেমন বন্ধুদেরকে যদি ব্যঙ্গ করা হয় বা তাদের সাথে মারামারি করা হয় বা তাদের ক্ষতি হয় এমন কিছু করা হয় তাহলে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে।

সাধারণ সম্পর্ক (Casual Relationship)

বন্ধু, পরিবারের সদস্য অথবা একান্ত ঘনিষ্ঠজনের বাইরে যাদের সাথে আমাদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে হয় তাদের সাথেই গড়ে ওঠে সাধারণ সম্পর্ক। যেমন- প্রতিবেশী, দোকানদার বা রিকশাচালক প্রভৃতি।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (Intimate Relationship)

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হচ্ছে এমন কিছু সম্পর্ক যেখানে আমরা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করি। আমরা তার জন্য ভাবি, চিন্তা করি ও সম্মান করি। সেও আমার জন্য ভাবে, চিন্তা করে এবং সম্মান করে। এখানে আমাদের আবেগ জড়িত। আবেগের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলি।

সুসম্পর্ক (Healthy Relationship)

সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস, বোঝাপড়া, ভালোবাসা আর সহমর্মিতার ভিত্তিতে। সব সম্পর্কেই কিছু প্রত্যাশা আর দায়িত্ব থাকে। নিজের বিশ্বাস মতামতের পাশাপাশি অন্যদের মতামত আর অনুভূতিকেও সম্মান জানাতে হবে। মনের কথা বলতে গিয়ে যদি আমরা সম্পর্ক নষ্ট করার ভয় পাই তাহলে বুঝতে হবে সেই সম্পর্ক সুসংহত নয়। সুসম্পর্কে চাপ প্রয়োগ বা জোর খাটানোর কোনো স্থান নেই। প্রকৃত বন্ধুরা একে অন্যের মতামত অনুধাবন করে এবং তার প্রতি সম্মান দেখায়। আমাদের সকলেরই সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর জন্য কাজ করা উচিত।

সব সম্পর্কই যে সুসম্পর্ক হবে এমন নয়। কোনো কোনো সময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অপ্রিয় বিষয়ও ঘটতে পারে। সাধারণত পরিবারের বাবা, মা, ভাই, বোন এবং অনেক সময় দাদা-দাদি, নানা-নানির উপস্থিতির কারণে শিশুদের জীবন হয় সহজ সরল ও দুশ্চিন্তামুক্ত। সেই বয়সে স্নেহ, মমতা, খাদ্য আর নিরাপত্তাই হয় মুখ্য বিষয়। শিশুদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাবা-মাকে কেন্দ্র করে কারণ তারাই এসবের উৎস। মানুষ যত বড় হয় তাদের সম্পর্কের ভিত্তিরও পরিবর্তন ঘটে যেমন- প্রেম, স্নেহ, সম্মান, বিশ্বাস, নিরাপত্তা, ভয়, লোভ। কখনোই কোনো সম্পর্ককে মূল্যহীন মনে করা উচিত নয়। সম্পর্কের উন্নতির জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে এবং অপরের প্রতি সম্মান, স্নেহ এবং মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। যেকোনো বস্তুর মতোই সম্পর্কেরও যত্ন এবং প্রতিপালন প্রয়োজন। সম্পর্ক যদি একবার ভেঙ্গে যায়, জোড়া লাগানোর পরেও সম্পর্কের ক্ষত স্থায়ী এবং ভঙ্গুর থেকে যায়।

৩.১.২ সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখার ABC

A is for Awareness (সচেতনতা), B is for Balance (ভারসাম্য), C is for Conscious Choice (জেনে বুঝে পছন্দ করা)।

A is for Awareness (সচেতনতা)

সচেতনতা মানে নিজের জ্ঞান ব্যবহার করে অন্য মানুষকে সম্মান করা আর একই সাথে নিজেও সম্মানিত হওয়া। সচেতনতার মানে খারাপ সম্পর্কের পরিণতি সম্পর্কে অবগত থাকা আর সম্পর্কের অবনতির বিপদ সংকেতগুলো বুঝতে পারা আর নিজের অধিকারের সীমারেখা চিহ্নিত করতে পারা। খারাপ সম্পর্ক হচ্ছে অসম সম্পর্ক যেখানে তুমি হয় নিপীড়নকারী না হয় নিপীড়িত।

B is for Balance (ভারসাম্য)

ভারসাম্য মানে একতরফা কোনো সম্পর্কে না জড়ানো যেখানে একজন আরেকজনের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ ও সফলতার অধিকারী। ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বুঝতে হবে যে, অন্যের মতামতেরও গুরুত্ব রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সকলের ইচ্ছার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

একই কথা পরিবার এবং বন্ধুদের ক্ষেত্রেও সত্যি। দু'জন মানুষ একসাথে অনেক কাজই করতে পারে যদিও তাদের পছন্দ ও ভালোলাগা ভিন্ন হতে পারে। তবে নিজের পছন্দ ও ভালোলাগার কাজগুলো করার জন্য সময় বের করে নিতে হবে। কেউ যদি নিজেকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে আরেকজনের পছন্দ, শখ আর জীবন যাত্রা অনুসরণ করতে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভারসাম্যহীন হতে বাধ্য। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। যদি তুমি বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার ভয়ে নিজের বিশ্বাসে অটল থাকতে অক্ষম হও, তবে সেই সম্পর্ক নড়বড়ে হতে বাধ্য। প্রকৃত বন্ধুরা একে অপরের মতামতের প্রতি সম্মান দেখায়।

C is for Conscious Choice (জেনে বুঝে পছন্দ করা)

সচেতনভাবে সম্পর্কে জড়ানোর অর্থ স্রোতে গা না ভাসিয়ে এই সম্পর্কের পরিণতি কী হবে তা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া। 'কীভাবে যেন হয়ে গেল'– এমন সম্পর্কে না জড়ানো এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। The ABCs: যোগাযোগ, বিশ্বাস এবং সম্মান এগুলো হচ্ছে সুসম্পর্কের ভিত্তি যা শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে।

অধিবেশন ২- সম্পর্কের মধ্যে প্রত্যাশা এবং দায়িত্ব

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- পারস্পরিক সম্পর্কের প্রত্যাশা ও দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে;
- সম্পর্কের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেতন হবে;
- সম্মতির অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

ভূমিকাভিনয়

ঘ) উপকরণ:

ভূমিকাভিনয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

শিক্ষার্থীরা যখন তাদের নিজ নিজ চরিত্রে অভিনয় করবে তখন তাদের অভিব্যক্তিগুলোর দিকে লক্ষ রাখুন। পরবর্তীতে মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক প্রদানের ক্ষেত্রে তা আপনার প্রয়োজন হবে। খেয়াল রাখবেন, অভিনয়ের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে রুঢ় অথবা অসংবেদনশীল আচরণ পরিহার করে।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

৬জন শিক্ষার্থীকে ডাকুন যারা স্বেচ্ছায় রোল-প্লে/ভূমিকাভিনয়ে আগ্রহী। ৩টি জোড়া তৈরি করুন। প্রত্যেক জোড়াকে নিম্নের একটি করে পরিস্থিতি অভিনয় করে উপস্থাপন করতে বলুন। জুটি গঠনের পরে শিক্ষার্থীদের রোল-প্লের বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দিন। যাতে অভিনয়ের সময় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সার্বিকভাবে প্রতিফলিত হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা সংলাপ তৈরি করবে। বাকি শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে এবং এই অভিনয়ের মাধ্যমে তারা কী বুঝলো তা লিখে রাখবে।

রোল-প্লে/ভূমিকাভিনয়ের পরিস্থিতি

১ নম্বর পরিস্থিতি

আলো আর রেশমা ভালো বন্ধু। সম্প্রতি রেশমার মনে হচ্ছে আলো তার সাথে ভালোভাবে কথা বলছে না।

২ নম্বর পরিস্থিতি

শামীম আর মিরাজ সবসময় একসাথে খেলাধুলা করে এবং দু'জনে সবকিছুই ভাগাভাগি করে নেয়, তা বইপত্র, খেলনা, নাস্তা যাই হোক। সম্প্রতি মিরাজের বাবার পদোন্নতি হয়েছে।

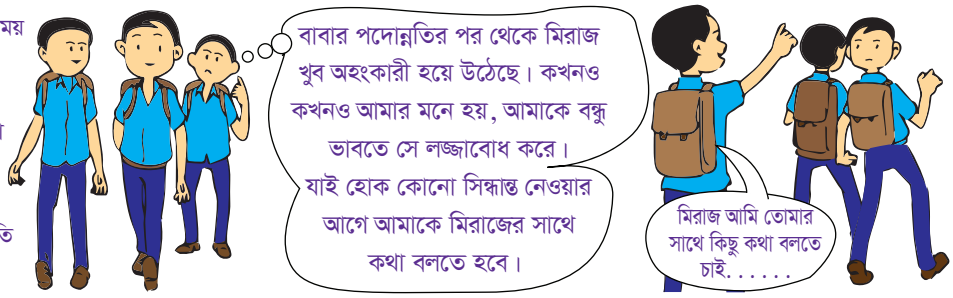

৩ নম্বর পরিস্থিতি

রিজভী এবং সারা ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো বন্ধু। দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী দুই পরিবারের শিশু হিসেবে তারা একই সাথে বেড়ে উঠেছে। সারা সকল কাজে রিজভীকে সহযোগী বলে মনে করে, আর রিজভীও বিভিন্ন কাজে সারাকে সহযোগিতা করে।

রোল-প্লে /ভূমিকাভিনয়- এরপরে নিচের প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে আলোচনা করুন–

- ১, ২ এবং ৩ নম্বর নাটকে অভিনীত সম্পর্কগুলোর বিষয়ে তোমাদের মতামত কী? তোমার জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কী?
- বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে দায়িত্ব এবং প্রত্যাশাগুলো কী কী? (শিক্ষার্থীদের নিজেদের কথা মাথায় রেখে খোলা মনে একটি তালিকা করতে বলুন। সহায়ক তথ্য ৩.২.১ এর আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কী কী প্রত্যাশা আমাদের পূরণ করা উচিত? কী কী ধরনের প্রত্যাশা পূরণ করা উচিত নয়?
- সম্পর্ক বজায় রাখতে আমাদের করণীয় কী?
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন 'সম্মতি' শব্দটির অর্থ কী? অনেকে বলে, 'নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ', কিংবা মেয়েরা যখন 'না' বলে তার মানে আসলে 'হ্যাঁ'। এগুলোর ব্যাপারে দুই একজনের কাছ থেকে তাদের মতামত শুনে নিন।
- এবার কোন পরিস্থিতিতে একজন জেনে বুঝে সম্মতি দিতে পারে এবং কী করে আমরা বুঝতে পারবো কোনো কাজে আমাদের বন্ধুর বা সঙ্গীর সম্মতি আছে কি না তা ব্যাখ্যা করুন।
- কোনো কাজে আমাদের বন্ধুর বা সঙ্গীর সম্মতি না থাকলে তার মত বা সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে হবে।

সহায়ক তথ্য ৩.২.২ এবং ৩.২.৩ এর আলোকে আলোচনাকে প্রাণবন্ত করুন এবং শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

রোল প্লে ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জনে সক্ষম হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

প্রতিটি মানুষ অন্যের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রতিটি সম্পর্কেই একে অন্যের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও প্রত্যাশা থাকে। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব ও সঠিক ও যুক্তিপূর্ণভাবে পালন করে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব থাকে তবেই সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত হয়।

মূল বার্তা

সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ইতিবাচক মনোভাব থাকা উচিত।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের বলুন জেমস ডায়েরির ৩১ নম্বর পৃষ্ঠার 'নিজেকে জানো, বন্ধুদের জানো' অনুচ্ছেদের কার্যক্রম বাড়িতে সম্পন্ন করতে এবং এই ব্যাপারে তাদের মতামত ৬১-৬৩ নম্বর পৃষ্ঠার উত্তরমালা 'নিজেকে জানো, বন্ধুদের জানো' এর সাথে মিলিয়ে নিতে। এ ছাড়া ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায় 'সম্মতি' বিষয়ক টিপ্‌সগুলো পড়তে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৩.২.১ সম্পর্কের দায়িত্ব ও প্রত্যাশা

পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু প্রত্যাশা থাকে। যেমন- পারিবারিক আস্থা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বাস ইত্যাদি। প্রত্যেকের এসব প্রত্যাশা পূরণের দিকে লক্ষ রাখা উচিত। এমন অনেক প্রত্যাশা থাকে যা কারও জন্য যেকোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূরণ করা কষ্টকর। যেমন- ছেলে-মেয়েরা মা- বাবার কাছে প্রত্যাশা করতে পারে, মা- বাবা তাদেরকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাবেন বা রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে যাবেন বা দামি কোন জিনিস কিনে দিবেন। সেক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় বা অন্য কোনো কারণে সেই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব নাও হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে মা-বাবার উচিত ছেলে-মেয়েকে বুঝিয়ে বলা যে কেন সেই প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয়। অপরাপর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করা উচিত। প্রত্যাশার পাশাপাশি সম্পর্কগুলোর কিছু দায়িত্ব পালনের ব্যাপারও থাকে। মা-বাবা, বন্ধু, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী প্রত্যেকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই উচিত একে অন্যের বিপদ আপদে সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী হওয়া। একের কর্মকাণ্ড দিয়ে যেন অন্যের কোনোরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। অসুখ-বিসুখে একে অন্যের সেবা করা, দেখভাল করা, প্রয়োজনে আর্থিক সহযোগিতা করা, যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে ব্যাপারগুলো সবই পারস্পরিক। প্রত্যেকেরই উচিত তাদের সেই দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের চেষ্টা করা। আন্তরিকতার সাথে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেই পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে এবং যেকোনো সমস্যা থেকে উত্তরণ সহজ হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি সম্পর্কের প্রতি প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত, সম্পর্কের প্রতিনিয়ত পরিচর্যা করা দরকার।

৩.২.২ সম্মতি

কোন পরিস্থিতিতে অর্থপূর্ণ সম্মতি দেয়া যাবে:

১. তুমি একটি নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে চাও কি না- তার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমার নিজেরই আছে এটা বিশ্বাস করো;
২. তোমার সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে ব্যক্ত করা এবং তা কাজে পরিণত করার জন্য নিজের জীবনের উপর যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তা তোমার আছে;
৩. তুমি কোনো কাজে সম্মতি দিতে চাও এবং সে কাজটির ফলাফল কী হতে পারে সেটা তুমি জানো। এই ফলাফলটি নিজে বোঝ এবং অন্যকেও খুলে বলার ক্ষমতা রাখো;
৪. এমন সম্পর্ক বা পরিস্থিতিতে যুক্ত হয় যেখানে তোমার সঙ্গী তোমার সিদ্ধান্ত বুঝবে ও সম্মান করবে;
৫. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সিদ্ধান্ত বা সম্মতি দিবে না;
৬. সম্মতি দেয়ার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে, এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকো।

অন্য কেউ অর্থপূর্ণ সম্মতি দিচ্ছে কি না তা কী করে বুঝবে?
মনে রাখবে-

- 'না' মানে কখনোই 'হ্যাঁ' নয়। 'না' মানে পরিপূর্ণভাবেই 'না'
- অপ্রকৃতিস্থ বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া মানে- 'হ্যাঁ' নয়
- 'আমি নিশ্চিত না' মানেই -'হ্যাঁ' নয়
- নীরবতা মানেই- 'হ্যাঁ' নয়

সম্মতি আছে কি না- তা প্রশ্ন করে জেনে নাও, মনে রাখবে, 'হ্যাঁ' মানে 'হ্যাঁ'।

৩.২.৩ না বলার সক্ষমতা

মানুষ প্রায়শই আবেগ দ্বারা চালিত হয়, যুক্তি দ্বারা নয়। জীবনের সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেককেই 'না' বলার প্রয়োজন হয় এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে হয় যা অল্পবয়সীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ। এমন হতে পারে যে, একজন শিক্ষার্থী তাঁর সহপাঠী বা প্রিয় বন্ধুর একটি প্রস্তাব পেলো যা তাকে মাদকে আসক্ত হতে বা অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থী হয়তো কিছুতেই এ প্রস্তাব মানতে চায় না, আবার বন্ধুত্বও নষ্ট করতে চায় না। এমন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে 'না' বলতেই হবে একবার এবং বারবার। সহপাঠী বন্ধুটি এবং অন্যরা তাকে জোর করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাকে দৃঢ়চেতা হতে হবে। 'না' বলার জন্য যা করা যেতে পারে-

- যুক্তি দেখাতে হবে;
- প্রস্তাবের ক্ষতিকর বিষয়টি তুলে ধরতে হবে এবং
- নিজ অবস্থানের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে হবে ও 'না' বলতে হবে।

মনে রাখতে হবে, না বলা শিক্ষার্থীর অধিকার। তার শরীর, জীবন এবং ভবিষ্যৎ তার নিজের। এগুলোর ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করতে কেউ তাকে জোর করতে পারে না।

অধিবেশন ৩- দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনার উপায় বিশ্লেষণ করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

পোস্টার পেপার, মার্কার, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

জন্ম থেকেই মানুষ কারও না কারও সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। নানা কারণে এই সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। নানা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব কীভাবে নিরসন করা যায় শিক্ষার্থীদের মতামতের যথার্থতার ব্যাপারে লক্ষ রাখুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- শিক্ষার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করুন। ১টি দলকে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ১টি দলকে বন্ধুর সাথে দ্বন্দ্ব এবং ১টি দলকে প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত কোনো ঘটনা/পরিস্থিতি জানা থাকলে তা পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বন্ধুর সাথে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব নিয়ে যে ঘটনাগুলো উপস্থাপন করা হলো তা থেকে নিরসনের উপায় কী?
- ১জন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরগুলো লিখতে বলুন।
- সহায়ক তথ্য ২.৩.১ অনুযায়ী উত্তরের সূত্র ধরে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

স্বাভাবিকভাবে সব সম্পর্কের ভিতর কিছু চাপ বা প্রত্যাশা থাকে যা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করতে পারে। এই চাপ সঠিকভাবে এবং যত্নের সাথে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে সম্পর্কের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পারস্পরিক আস্থা, সম্মান আর খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব।

মূল বার্তা

পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আস্থার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব মীমাংসা সম্ভব।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

শিক্ষার্থীদের বলুন জেমস ডায়েরির ২৪-২৬ নম্বর পৃষ্ঠার 'কে সঠিক কে ভুল?' অনুচ্ছেদের কার্যক্রম শেষ করে তাদের মতামত জানতে চান। নিচের বিষয়গুলোতে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তারা পরস্পরের সাথে বিনিময় করে নিতে পারে:

- তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল কি না এবং তারা কীভাবে তা সমাধান করেছিল?
- যদি তাদের খুব ভালো সম্পর্ক থেকে থাকে, কীভাবে তারা তা বজায় রাখে এবং এটা তাদের কীভাবে সাহায্য করেছিল?

সহায়ক তথ্য

৩.৩.১ দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায়

নানা কারণে পরিবার, বন্ধু ও সমাজের অন্যদের সাথে সম্পর্কের মধ্যে অনেক সময় দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কোনো বিষয়ে মতের অমিল হলে একে অপরের প্রতি বিরক্ত হয়, কখনো কখনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এমনকি আরো অনেক কারণে একজনের সাথে অন্যজনের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে বা সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে। একে অন্যের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য বা ভালো রাখার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুর সাথে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের কিছু উপায় দেয়া হলো যেমন–

- পরিবারের সকলের মধ্যে আবেগীয় বন্ধন;
- পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা;
- কারো সাথে আঘাত দিয়ে কথা না বলা;
- পরিবারের সকল সদস্যের সাথে মিলেমিশে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণ করা;
- প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করা ও সহমর্মিতা দেখানো;
- প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা;
- পারিবারিক বা সামাজিক উৎসবগুলোতে প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা;
- প্রতিবেশীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা নিরসনে কার্যকর ভুমিকা রাখা;
- বন্ধুদের ভালো কাজে সমর্থন করা;
- তাদের বিপদে সাহস জোগানো;
- বিরক্ত বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ না করা;
- বন্ধুর ভিন্নমতের প্রতি সম্মান দেখানো;
- মতানৈক্যের বিষয়ে যুক্তিসহ খোলামেলা কথা বলা;
- আঘাত দিলে ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদি।

পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধর বা আত্মীয় স্বজন যে কারো সাথে যে কোনো কারণে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তবে কোনো দ্বন্দ্বই দীর্ঘস্থায়ী করা উচিত নয়। তাই যদি আমাদের কারো সাথে দ্বন্দ্ব বা মনোমালিন্য তৈরি হয়েই যায় তখন যে কোনো একজন এগিয়ে যাওয়া উচিত, অন্যজনেরও উচিত তাকে স্বাগত জানানো তবেই পুরোনো সম্পর্ক আবারও নতুন ও সুন্দর রূপ পাবে।

বর্ষ-২ (দুই) মডিউল-৪

বাল্যবিবাহ ও এর প্রতিরোধ

৪.ক. উদ্দেশ্য

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে সক্ষম ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৪.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে;
- বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বুঝতে পারবে;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বর্ণনা করতে পারবে;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নিজেদের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে;
- বাল্যবিবাহ রোধে সচেতন হবে।

৪.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফল
- অধিবেশন ২ - বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীদের ভূমিকা

অধিবেশন ১ - বাল্যবিবাহ, বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফলসমূহ

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাল্যবিবাহের কারণ ও ফলাফল চিহ্নিত করতে পারবে;
- বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বুঝতে পারবে;
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বর্ণনা করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

দলগত কাজ, কেস স্টাডি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়

ঘ) উপকরণ:

পেপার/ পোস্টার পেপার, মার্কার কলম, চক ও বোর্ড, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

বাল্যবিবাহের ঘটনা বর্ণনা করার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে বর-কনের আনুমানিক বয়স, আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা তুলে ধরে সে বিষয়ে সহযোগিতা করুন। অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষ হলে এমনভাবে প্রশ্ন করুন যাতে এর কারণ ও কুফল বেরিয়ে আসে। তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা যে কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য নয় তা নিশ্চিত করুন। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- অধিবেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন।
- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা কোনো বাল্যবিবাহের কথা শুনেছে কি না বা নাটকে বাল্যবিবাহ দেখেছে কিনা। ২/৩ জনকে তা বর্ণনা করতে বলুন। বাল্যবিবাহের সম্ভাব্য কারণগুলো তাদের থেকে শুনে নিন।
- এবার বাল্যবিবাহ নিয়ে জেমস ডায়েরির ৫৯ নম্বর পৃষ্ঠার টুম্পার গল্পটি পড়তে বলুন।
- এভাবে বাল্যবিবাহের ধারণা স্পষ্ট করুন (সহায়ক তথ্যের ৩.১.১ এর সাহায্য নিন)।

দলগত কাজ:

- অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করে নিম্নের কেস স্টাডিটি পর্যালোচনার জন্য দিন।

কেস স্টাডি

আসমার গল্প

আসমা একজন ১৬ বছর বয়সী কিশোরী। সে তার পরিবারের সাথে থাকে। আসমা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার স্বপ্ন দেখে। তার বাবা পেশায় একজন বাস শ্রমিক। অভাব অনটনের সংসারে কোনো রকমে দিন চলে। তাই সংসারের বোঝা কমানোর জন্য আসমাকে তাড়াতাড়ি আপন বোনের ছেলে ওবায়দুলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। কারণ তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে পারলে যৌতুক কম লাগবে এবং মেয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার করবে। কিন্তু এর ফলে তার

এবং পরবর্তীতে তার স্বামীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের কিছু দিন পরই আসমা গর্ভধারণ করে। এই খবরটি শুনে সে খুব হতবাক হয়ে যায়। কারণ সে গর্ভধারণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবা প্রদানকারীর সাথে আলোচনার সময় সে জানায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না। সে গর্ভকালীন ও প্রসবের সময় বিভিন্ন জটিলতার মধ্য দিয়ে যায়। আসমার স্বামী কর্মসংস্থান করতে না পারায় আর্থিক সংকটের জন্য তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয় এবং স্বামী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। পরে তাদের সন্তান দুই বছর বয়সে অপুষ্টিজনিত কারণে মারা যায়।

অতঃপর নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তাদের থেকে জানতে চান-

- আসমার জীবনে কী পরিণতি ঘটেছে? এর কারণ কী?
- তার জীবনে বাল্যবিবাহের প্রভাবগুলো কী?
- কৈশোরকালীন গর্ভধারণের ফলে সে কোন কোন জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে?

- এবার প্রতিটি দলকে প্রশ্নগুলোর উত্তর কী তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- দলগুলোকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। বাল্যবিবাহের কারণগুলো জানতে চান। এবার সহায়ক তথ্য ৪.১.২ এর মাধ্যমে ধারণাকে স্পষ্ট করে দিন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন বাল্যবিবাহের আর কী কী ক্ষতিকর প্রভাব আছে। দু'একজনের কাছ থেকে উত্তর শুনে নিন। সহায়ক তথ্য ৪.১.৩ এর মাধ্যমে ধারণাকে স্পষ্ট করুন।
- ব্যাখ্যা করুন, অনেক সময় বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা কিশোরী বয়সে অর্থাৎ ২০ বছরের আগে গর্ভধারণ করে। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, এতে মেয়েটির এবং তার শিশুর কী কী ক্ষতি হতে পারে? এবার সহায়ক তথ্য ৪.১.৪ এর মাধ্যমে ধারণাকে স্পষ্ট করে দিন।
- এবার সহায়ক তথ্য ৪.১.৫ এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি ব্যাখ্যা করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা একক কাজ ও দলগত কাজের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কি না তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

১৮ বছরের কম বয়সে মেয়েদের এবং ২১ বছর এর কম বয়সে ছেলেদের বিয়ে হলে আইনগতভাবে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাল্যবিবাহের ফলে ছেলে- মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

মূল বার্তা

২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ, কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের পথে প্রতিবন্ধক।

চলো একত্রে আলোচনা করি

জেমস ডায়েরির কার্যক্রম:

জেমস ডায়েরির ৪৫ নম্বর পৃষ্ঠার 'অপরিণতের পরিণতি' ছড়াটি পড়তে বলুন। পড়া শেষ করে তাদের মতামত জানতে চান। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তারা পরস্পরের সাথে বিনিময় করতে পারে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করতে তারা কী করতে পারে তা ডায়েরিতে লিখতে বলুন।

সহায়ক তথ্য

৪.১.১ বাল্যবিবাহ কী?

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। বাংলাদেশের সকল ধর্ম/সম্প্রদায়ের জন্য বিয়ের আইনগত বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর। উল্লিখিত বৈধ বয়সের কমবয়সী কোনো ছেলে ও মেয়েকে যদি বিয়ে দেয়া হয়, তখন তাকে বলা হবে বাল্যবিবাহ।

৪.১.২ বাল্যবিবাহের কারণ

- দারিদ্র্য;
- নিরাপত্তার অভাব;
- মেয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য;
- কন্যাশিশুর লালন পালনের আর্থিক দায় থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা;
- মাসিক হওয়ার পরপরই সাবালিকা ভাবার কারণে;
- বাবা-মায়ের সাধ আহ্লাদ মেটানোর জন্য কম বয়সী মেয়ে বিবাহ করার প্রবণতা;
- জন্ম নিবন্ধন না হওয়া;
- বিবাহ নিবন্ধন না হওয়া;
- সম্পত্তি পাওয়া বা রক্ষার জন্য;
- শিক্ষার অভাব;
- সামাজিক প্রথা, কুসংস্কার ও সামাজিক চাপ;
- আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা;
- মেয়েদের আয়মুখী কর্মের সুযোগ কম;
- যৌতুক কম দেয়ার আকাঙ্ক্ষা;
- বিবাহ পরবর্তী সমস্যা ও অসুবিধা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৪.১.৩ বাল্যবিবাহের প্রভাব

নিচে বাল্যবিবাহের প্রভাব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত

- ১৮ বছরের আগে বিয়ে হলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২০ বছরের আগে সন্তান আসায় কিশোরীদের কোমরের গঠন সম্পন্ন না হওয়ার ফলে সন্তান হওয়ার সময় মা ও সন্তানের মারা যাওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে;
- কম বয়সে সন্তান জন্ম দেয়ার ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, পুষ্টিহীনতায় ভোগে, নানা অসুখ হয়;
- খুব অল্প বয়সে সন্তান হলে জরায়ু ক্যান্সার হতে পারে, প্রস্রাবের নালিতে ঘা হতে পারে;
- অন্যান্য জটিল অসুখের আশঙ্কা থাকে।

শিক্ষা জীবন

- অপরিণত বয়সে সংসারের চাপে লেখাপড়া বন্ধ হয়;
- উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয় না;
- পরিবারের সদস্যরা শিক্ষা বিষয়ে সহযোগিতা করে না।

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

- সমাজ ও সংসারের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের জন্য এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে সংসারে কোন্দল দেখা দেয় এবং সে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়;
- কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারায়;
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো হয় না;
- তালাক-প্রাপ্ত হতে হয়, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয় ;
- কখনো কখনো পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়;
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।

পরিবারের উপর প্রভাব

- আর্থিক ক্ষতি হয়;
- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়;
- মা-বাবার মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি হয়;
- এ বয়সে মেয়েদের মা হওয়ার শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা না হওয়ার ফলে গর্ভবতী ও প্রসূতি অবস্থায় নিজের ও সন্তানের যত্ন নিতে পারে না;
- সন্তানের সার্বিক বিকাশ ঘটে না।

সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রভাব

- শিক্ষার হার কমে যায়;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়;
- সামাজিক সমস্যা যেমন– যৌতুক, তালাক, বহুবিবাহ ও পতিতাবৃত্তি বাড়ে;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৪.১.৪ কৈশোরকালে গর্ভধারণ

বাল্যবিবাহের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো কৈশোরকালে গর্ভধারণ। বাল্যবিবাহের ফলে অনেক কিশোরী ২০ বছরের আগে গর্ভধারণ করে। এ সময় তারা গর্ভধারণের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয় না, পাশাপাশি তাদের শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে পড়ে। ফলে তারা অনেক রকম ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে তারা দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। যা তাদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের জন্যও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কৈশোরকালে গর্ভধারণের ঝুঁকি

- কিশোরী বয়সে গর্ভধারণ গর্ভকালীন ও প্রসবে জটিলতা, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় কারণ ২০ বছরের পূর্বে মেয়েদের শরীর সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয় না;
- মেয়েদের দেহের পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই যদি কেউ সন্তান ধারণ করে তাহলে তার দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়;
- সন্তান প্রসবের সময় জটিলতার কারণে প্রস্রাবের রাস্তা ছিঁড়ে যেতে পারে, প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা এক হয়ে যাওয়াসহ অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়;
- কিশোর বয়সে ছেলে-মেয়েদের মা-বাবা হবার মতো মানসিক ও শারীরিক পূর্ণতা আসে না।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হচ্ছে জন্মপ্রতিরোধমূলক পদ্ধতি যা একজন নারীকে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে। যেমন - গর্ভনিরোধক খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, আইইউডি, ইমপ্লান্ট, লাইগেশন বা টিউবেকটমি (নারীর জন্য স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি) এবং ভ্যাসেকটমি (পুরুষের জন্য স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি)। এছাড়াও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এড়াতে জরুরী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে ইসিপি (ইমারজেন্সি কনট্রাসেপ্টিভ পিল) বহুল পরিচিত।

৪.১.৫ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ কী?

বাংলাদেশ সরকার বাল্যবিবাহ রোধের জন্য ২০১৭ সালে সকলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সময়োপযোগী একটি আইন প্রণয়ন করে। যেটি বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ নামে অভিহিত। এই আইনটি ২০১৭ সালের ১১ মার্চ, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

বাল্যবিবাহ কেন অপরাধ?:

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ মোতাবেক একুশ (২১) এর নিচে ছেলে (অপ্রাপ্তবয়স্ক) এবং আঠারো (১৮) এর নিচে (অপ্রাপ্তবয়স্ক) কোনো মেয়েকে বিয়ে দেয়া যাবে না। যদি এই বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হয় তা আইনত অপরাধ গণ্য হবে এবং এ অপরাধ দমনের লক্ষ্যে আইনে বিভিন্নমুখী শাস্তির বিধান হয়েছে।

বাল্যবিবাহের শাস্তি কী?:

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী বর ও কনের জন্য:

১) প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ (১৮ বা ২১ বছরের উর্ধ্বে), অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ (১৮ বা ২১ বছরের নিচে) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবে। এজন্য তিনি/তারা দুই (২) বছরের কারাদণ্ড বা এক (১) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডই পেতে পারেন। কেউ যদি অর্থদণ্ড প্রদানে সমর্থ না হন অথবা না দেন সে ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিন (৩) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো নারী বা পুরুষ পরস্পরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তিনি/তারা এক (১) মাসের আটকাদেশ বা পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহের সাথে জড়িত থাকার কারণে বাবা/মা বা সংশ্লিষ্টদের শাস্তি হয় সে ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের শিকার ঐ ছেলে বা মেয়ে শাস্তির আওতায় আসবে না।

বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি

পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি,আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে/মেয়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে বা জোরপূর্বক বাধ্য করে বাল্যবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অথবা বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করার জন্য অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করেন, অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে এটি একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য তিনি/তারা অনধিক দুই (২) বছর ও অন্যান্য ছয় (৬) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক তিন (৩) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনাকারীর শাস্তি:

কোনো ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করেন, তা একটি অপরাধ এবং এজন্য তিনি অনধিক দুই (২) বছর ও অন্যূন ছয় (৬) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক তিন (৩) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি:

কোনো বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দুই (২) বছর ও অন্যূন ছয় (৬) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। যদি তিনি অর্থদণ্ড প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক তিন (৩) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া নিবন্ধকের লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হবে।

মিথ্যা অভিযোগকারীর শাস্তি:

বাল্যবিবাহ নিয়ে কোন ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ করলে এবং অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হলে অনধিক ছয় (৬) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক এক (১) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

বাল্যবিবাহ রোধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন যারা:

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি কারো মাধ্যমে বাল্যবিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হলে তা বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিবাহের বয়স প্রমাণের জন্য কী কী প্রমাণক উপস্থাপন করতে হবে:

জন্মনিবন্ধনের সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের শিক্ষা সনদ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পরীক্ষার সার্টিফিকেট বা সমমানের শিক্ষা সনদ অথবা পাসপোর্ট বয়স প্রমাণের দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

কত দিনের মধ্যে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ আমলে নেয়া যায়:

বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দুই (২) বছরের মধ্যে এটি অপরাধ হিসেবে আমলে নেয়া যায়।

অধিবেশন ২ - বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীদের ভূমিকা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নিজেদের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবে;
- বাল্যবিবাহ রোধে সচেতন হবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি ও কৌশল:

জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ

ঘ) উপকরণ:

পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড, মাস্কিং টেপ

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

বাল্যবিবাহ সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাই একে মোকাবেলা করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করুন। শিক্ষার্থীরা বোঝে এমন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করুন। তারা যাতে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- অধিবেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তাদের কাছে জানতে চান–
  - বাল্যবিবাহ কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
- উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন। সহায়ক তথ্য ৪.২.১ এর আলোকে তা স্পষ্ট করুন।

জোড়ায় কাজ:

- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসে বাল্যবিবাহ রোধে কারা কারা সহযোগিতা করতে পারে, তার একটি তালিকা নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন।
- কয়েকটি জোড়ার কাছ থেকে তাদের উত্তরগুলো শুনুন এবং অন্যদেরও অংশগ্রহণ করতে বলুন।
- বোর্ডে একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন এবং সহায়ক তথ্য ৪.২.২ এর আলোকে ধারণাগুলো স্পষ্ট করুন।

দলগত কাজ:

- 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীরা কী ভূমিকা রাখতে পারে?' প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে প্রতিটি দলকে তাদের নিজ নিজ পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপন করার পর সহায়ক তথ্য ৪.২.৩ এর আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এবার শিক্ষার্থীদের জেমস্ ডায়েরির ৫৯-৬০ নং পৃষ্ঠার বাল্যবিবাহের প্রভাব/ফলাফল এবং বাল্যবিবাহ রোধে কিশোর-কিশোরীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দুটির উত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলুন।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কাজ ও দলগত কাজের মাধ্যমে এই অধিবেশনের শিখনফল অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত হোন।

সার-সংক্ষেপ:

বাল্যবিবাহ বন্ধে সমাজের প্রত্যেকেই যার যার জায়গা থেকে ভূমিকা রাখতে পারে। এককভাবে এটা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এর জন্য সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা দরকার। কিশোর-কিশোরীরা যেহেতু বাল্যবিবাহের শিকার হয় তাদেরই এর বিরুদ্ধে বেশি সোচ্চার হওয়া জরুরি। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তারা তাদের পরিবারকে সচেতন করতে পারবে। তার নিজের এবং অন্যদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে পারবে।

মূল বার্তা

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমরা সবাই সোচ্চার হবো।

সহায়ক তথ্য

৪.২.১ বাল্যবিবাহ রোধে করণীয়:

- নিজের বা বন্ধু/সঙ্গীদের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করা হলে বাবা-মার সাথে আলোচনা করে দৃঢ়ভাবে এ ব্যবস্থা প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াতে হবে;
- সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন-এর বিষয়ে সকলকে জানাতে হবে;
- মা-বাবা, অভিভাবক এবং কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে;
- কোথাও বাল্যবিবাহ ঠিক হলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে বাল্যবিবাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে হবে।

৪.২.২ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহযোগিতা:

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে পারে। এককভাবে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কারা কীভাবে এগিয়ে আসতে পারে তা নিম্নে দেয়া হলো:

পরিবার

মেয়ে শিশুকে পড়া লেখার সুযোগ তৈরি করে দেয়া, মেয়েদের আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, কমপক্ষে ১৮ বছরের আগে মেয়েকে বিয়ে না দেয়া।

প্রতিবেশী

কোনো পরিবারের মেয়েকে বাল্যবিবাহ দিতে নিরুৎসাহিত করা, বাল্যবিবাহের কুফল এলাকার সকলকে জানানো, যে পরিবার বাল্যবিয়ে ঘটায় তাদের সামাজিক ও আইনগত শাস্তির আওতায় নিতে সহযোগিতা করা।

শিক্ষক

অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানানো, মেয়েদের লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝানো ও মেয়েদের সময় উপযোগী শিক্ষার তথ্য ও সুযোগ দেয়া।

স্থানীয় সংগঠন

দলীয়ভাবে এলাকায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করা, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে এলাকাবাসীকে জানানো, নারী অধিকার/মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সমাজের নারী ও মেয়েদের সচেতন করে তোলা।

কাজি

বিয়ের সময় মেয়ে ও ছেলের বিয়ের আইনগত বয়স ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করা, মেয়ের বয়স ১৮ বছর ও ছেলের বয়স ২১ বছর না হলে বিয়ে না পড়ানো, অভিভাবকরা যদি বয়স লুকিয়ে বিয়ে দিতে চায় তার প্রতিবাদ করা ও সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানানো।

ইউনিয়ন পরিষদ

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এলাকায় পরিচালনা করা, বাল্যবিবাহ দিলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা, এলাকায় মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

বাল্যবিবাহের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ প্রতিহত করতে দায়িত্ববান ব্যক্তিবর্গকে কঠোরভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা, এলাকায় মেয়ে শিশুর শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

অপরাধীকে ধরা ও শাস্তি দিতে সহযোগিতা করা, শিশু পাচার রোধে কঠোর ভূমিকা রাখা।

শিক্ষার্থী নিজে

বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে পরিবারে সচেতনতা সৃষ্টি করা। অভিভাবকরা কম বয়সে বিয়ে দিতে চাইলে তার প্রতিবাদ করা ও সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানানো।

৪.২.৩ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোর-কিশোরীর ভূমিকা:

কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে পরিবারের সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। অভিভাবকরা কম বয়সে বিয়ে দিতে চাইলে তার প্রতিবাদ করতে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের জানাতে হবে:

- তোমার বিশ্বস্ত কাউকে যেমন– নিকট আত্মীয় এবং এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জানাও;
- তোমার এলাকার চেয়ারম্যান অথবা মেম্বারকে জানাও;
- তোমার স্কুলের শিক্ষককে জানাও;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ/ইউএইচএন্ড এফডব্লিউসি ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাও। এক্ষেত্রে তাদের নম্বর আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখো এবং অন্য বন্ধুদেরকেও জানিয়ে রাখো;
- বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারি সহযোগিতা নম্বর ১০৯ এ ফোন করো।

বর্ষ-২ (দুই) মডিউল-৫

দৃঢ় প্রত্যয়ী যোগাযোগ

৫.ক. উদ্দেশ্য

দৃঢ় প্রত্যয়ী যোগাযোগ ও চাপ মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা।

৫.খ. শিখনফল

এই মডিউল শেষে শিক্ষার্থীরা-

- কার্যকর যোগাযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- কার্যকর যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করতে পারবে;
- দ্বিধাহীন যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে;
- দ্বিধাহীন যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে;
- সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক সৃষ্ট চাপসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে;
- সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক সৃষ্ট চাপসমূহ মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

৫.গ. অধিবেশনসমূহ

- অধিবেশন ১ - কার্যকর যোগাযোগের ধারণা
- অধিবেশন ২ - দ্বিধাহীন যোগাযোগ
- অধিবেশন ৩ - সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক চাপ এবং চাপ মোকাবিলা করার উপায়

অধিবেশন ১ - কার্যকর যোগাযোগের ধারণা

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- কার্যকর যোগাযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে; এবং
- কার্যকর যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় চিহ্নিত করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

রোল-প্লে/ ভূমিকাভিনয় এবং আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

মার্কার পেন, হোয়াইট বোর্ড

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

যোগাযোগ শুধু বক্তব্য দিয়ে কিংবা সংজ্ঞায়িত করার চেয়ে যোগাযোগ হাতে-কলমে দেখানো অনেক বেশি কার্যকর। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ খুঁজে নিন যা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য হয়।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- কুশল বিনিময় করুন। একটি কাগজে 'সবাই উঠে দাঁড়াও' নির্দেশনা লিখে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করুন। এবার হাত নেড়ে তাদের বসতে বলুন।
- এবার সবার কুশলাদি মৌখিকভাবে জিজ্ঞেস করুন। প্রশ্ন করুন- লিখিত নির্দেশনা, হাতের ইশারা এবং মৌখিক ভাষার মাধ্যমে কোন কাজটি করার চেষ্টা করা হয়েছে?
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নটি করে বোর্ডে বড় করে লিখুন 'কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা'। বলুন এ বিষয়ে আমরা দু'টি ভূমিকাভিনয় করবো।

সময়: ১০ মিনিট

রোল প্লে ১:

- দু'জন শিক্ষার্থীকে জোড়া বেঁধে মুখোমুখি এবং কাছাকাছি বসতে বলুন। দু'জনের একজনকে জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অপরজনকে বলতে বলুন। অপরজন খুব মন দিয়ে সক্রিয়ভাবে বক্তার কথা শুনবে। ১ মিনিট পার হলে বক্তাকে থামতে বলুন। শ্রোতাকে প্রশ্ন করুন যা শুনছে তা ঠিকমতো বলতে পারবে কি না। সম্ভাব্য উত্তর হবে 'হ্যাঁ', শ্রোতার বক্তব্য শুনুন।

- এবার প্রথমবার যে শিক্ষার্থী শ্রোতা ছিলো, তাকে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলুন। অপর জনকে বলুন শ্রোতা হতে। অমনোযোগী শ্রোতা এদিক সেদিক তাকাবে, হাই তুলবে ইত্যাদি। ১ মিনিট পার হলে বর্ণনা থামাতে বলুন। শ্রোতাকে প্রশ্ন করুন বক্তা যা বলেছে, সে যা শুনেছে, তা ঠিকমতো বলতে পারবে কি না। সম্ভাব্য উত্তর আসবে 'না', শ্রোতার বক্তব্য শুনুন। আলোচনার মাধ্যমে মনোযোগ দিয়ে শোনার কার্যকারিতা তুলে ধরুন।

রোল প্লে ২:

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দু'জনকে দু'টি চেয়ারে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে বসতে বলুন। একজনের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বলতে বলুন। অন্যজন স্বাভাবিকভাবে শোনার চেষ্টা করবে। ১ মিনিট পর বক্তাকে থামতে বলুন। শ্রোতাকে প্রশ্ন করুন বক্তা যা বলেছে তা সঠিকভাবে শুনতে পেরেছে কি না। সম্ভাব্য উত্তর 'না', শিক্ষার্থীর (শ্রোতার) কথা শুনুন।

- এবার দু'জনকে কাছাকাছি এবং মুখোমুখি বসতে বলুন। প্রথমজনকে আবার বলতে বলুন। ১ মিনিট পর থামতে বলুন। এবার শ্রোতাকে বলুন বক্তা যা বলেছে তা ঠিকভাবে শুনেছে কি-না। সম্ভাব্য উত্তর 'হ্যাঁ', শ্রোতার বক্তব্য শুনুন।

- আলোচনার জন্য প্রশ্ন করুন:
  - যোগাযোগের বিভিন্ন উপায় কী কী?
  - কোনো শব্দ উচ্চারণ না করলেও কীভাবে আমরা একজন ব্যক্তির আবেগ অনুধাবন করতে পারি?
  - সামনে না থেকে এবং কোনো কিছু ভাগাভাগি না করা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি কী বলতে চায় তা কীভাবে আমরা বুঝতে পারবো?
  - একজন মানুষ কীভাবে কার্যকরভাবে শুনতে পারে?

- ১ম ও ২য় বক্তব্যের পার্থক্য বুঝিয়ে কার্যকর যোগাযোগে সক্রিয়ভাবে শোনার গুরুত্ব পরিষ্কার করুন। সহায়ক তথ্য ৫.১.১ এর সাহায্যে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিখন অর্জন যাচাই করুন:

- কার্যকর যোগাযোগ বলতে আমরা কী বুঝি?
- কার্যকর যোগাযোগের উপায় কী কী?

সার-সংক্ষেপ:

আবেগ প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে যোগাযোগ। আমাদের দৃঢ়ভাবে, আত্মবিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

মূল বার্তা

নিরাপদ জীবনের জন্য অবশ্যই কার্যকর যোগাযোগ করতে হবে।

সহায়ক তথ্য

৫.১.১ যোগাযোগের ধারণা:

যোগাযোগ হচ্ছে তথ্যের আদান-প্রদান; যা কিনা দু'জন ব্যক্তি, একটি গোষ্ঠী অথবা একটি উৎস থেকে অনেক মানুষের মধ্যে হতে পারে। যোগাযোগ বাচনিক হতে পারে, যেমন- লিখে বা মুখে কথা বলার মাধ্যমে আবার অবাচনিকও হতে পারে। অবাচনিক যোগাযোগ হচ্ছে ভাষার ব্যবহার ছাড়া যোগাযোগ। এক্ষেত্রে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি আর ইশারার মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা প্রকাশিত হয়। এর ভেতর আছে তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ, দেহভঙ্গি, সুখ ও দুঃখের ভাব, চোখের ইশারা, গলার স্বর, দু'জন ব্যক্তির মাঝে শারীরিক দূরত্ব, স্বরের উঠানামা অথবা যেকোনো ধরনের স্পর্শ ইত্যাদি। এগুলো সবই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিবেচ্য বিষয়।

যোগাযোগের মাধ্যম তিনটি

১. লিখিত
২. মৌখিক ও
৩. শরীরী ভাষা

যোগাযোগের জন্য দু'টি দল/দু'জন ব্যক্তি/এক ব্যক্তি ও এক দল দরকার হয়- বার্তা প্রেরক ও বার্তা গ্রাহক। যখন প্রেরিত বার্তা ঠিকমতো প্রস্তুত করা হয়, সঠিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে যথা সময়ে পৌঁছানো হয়, বার্তা গ্রাহক তখন বার্তাটি সঠিকভাবে বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন। কী করছেন, যথাসময়ে ঠিক মতো জানানো হচ্ছে কার্যকর যোগাযোগ।

যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনের উপায়গুলো:

- মন দিয়ে পড়ার এবং শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা
- বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করা
- বলার সময় স্পষ্ট স্বরে ও লিখার সময় সঠিক শব্দ ব্যবহার করা
- অন্যকে দোষারোপ বা আঘাত করে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা।
- কথা বার্তা বলার সময় যাচাই করা যে অন্যজন বুঝতে পারছে কি না
- যার সাথে কথা বলছেন তার কথায় সাড়া দেয়া
- গঠনমূলক সমালোচনা করা
- প্রয়োজন হলে ক্ষমা চাওয়া
- আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা।

সক্রিয়ভাবে শোনা:

শোনার সময় প্রয়োজন হলে সাড়া দেয়া, না বুঝলে জিজ্ঞাসা করা।

কারও দিকে না তাকিয়েও শব্দ ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে আমরা আমাদের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে পারি। সঠিক যোগাযোগের অর্থ, একজন যখন বলবে শ্রোতা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এটা হচ্ছে বাচনিক যোগাযোগ।

এই ধাপে তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। তবে মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের জন্য কখন কী বিষয়ে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা কঠিন।

আংশিক শোনা

এক্ষেত্রে আমরা বক্তব্যের কিছু বিশেষ অংশ শুনি যদিও পুরো বক্তব্য শোনার অভিনয় চালিয়ে যাই। উদাহরণস্বরূপ একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যখন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ছোট শিশুর কিচির মিচির কথা শোনে আর মাঝে মাঝে উহ্ আহ্ করে।

কার্যকরভাবে শোনা

এক্ষেত্রে আমরা মাথা নাড়াই, পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করি, সারসংক্ষেপ করি অথবা প্রতিক্রিয়া জানাই। মনোযোগ দেওয়া, কার্যকর প্রতিক্রিয়া জানানো এবং সঠিক প্রশ্নের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া কার্যকর শ্রবণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা হলো শ্রোতা অনেক সময় নিজের প্রতিক্রিয়া নিয়েই বেশি চিন্তিত হয়ে পড়তে পারে। 'আমি এরপর কী বলবো' এই ভাবনা অনেক সময় অপরের বক্তব্য পুরোপুরি শোনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সহমর্মিতার সাথে শোনা

এক্ষেত্রে চোখ, হৃদয় আর মন দিয়েও আমরা শুনি। যা বলা হয় তা যেমনি শুনি, যা বলা হয় না তাও গুরুত্বের সাথে বোঝার চেষ্টা করি। বক্তব্যের অবাচনিক ইঙ্গিতের দিকেও খেয়াল রাখি। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যখন অগোছালো কাপড়ে নত মস্তকে নিচু গলায় বলে 'আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?' এই কথার সাথে অবাচনিক যোগাযোগ বিবেচনায় নিলে সহজেই বোঝা যায় ঐ ব্যক্তিটি ভালো নেই। এই ব্যক্তির কথা সহমর্মিতা ও মনোযোগের সাথে শুনলে তা হবে সহমর্মিতার সাথে শোনা। শ্রবণ এমন একটি শিল্প এবং দক্ষতা যার চর্চা প্রয়োজন। এভাবেই আমরা কার্যকর যোগাযোগকারী হতে পারবো।

অধিবেশন ২: দ্বিধাহীন যোগাযোগ

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- দ্বিধাহীন যোগাযোগের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে;
- দ্বিধাহীন যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করতে করবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

রোল-প্লে/ ভূমিকাভিনয় এবং আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

রোল-প্লের দৃশ্যপট

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

কিছু বিষয় কতিপয় শিক্ষার্থীর আবেগের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাদেরকে আলাদাভাবে বোঝাতে হবে যে এক্ষেত্রে দ্বিধাহীন যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। দ্বিধাহীনতা কার্যকর যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। তবে দ্বিধাহীনতা আর রূঢ়তার মাঝে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহায়তা করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

- কিছু শিক্ষার্থীকে ডেকে তিনটি দল তৈরি করুন। প্রত্যেকটি দলকে রোল-প্লে'র জন্য একটি দৃশ্যপট দিন। প্রত্যেকটি রোল-প্লে'র পরে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান যে, সবগুলো প্রতিক্রিয়া দ্বিধাহীন যোগযোগের শর্ত পূরণ করেছে কিনা? যদি তা না হয় তবে অন্যদের এগিয়ে এসে সঠিকভাবে অভিনয় করে দেখাতে বলুন। শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখছে কিনা তা লক্ষ রাখুন–
    - চোখে চোখ রেখে কথা বলা।
    - আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা।
    - "আমার বক্তব্য (My message)" ব্যবহার করে সমস্যা বা আচরণের কথা এমনভাবে বলা যাতে কেউ আতংকিত না হয়। যেমন- আমার একটু সমস্যা হচ্ছে এবং আমি এই ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

পরিস্থিতি

- একজন ছেলে আরেকজনকে ধাক্কা দিচ্ছে। কীভাবে দ্বিতীয় ছেলেটি শারীরিক শক্তি প্রয়োগ না করে প্রথমজনকে প্রতিরোধ করবে?
- একজন ছেলে একজন মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে। কীভাবে মেয়েটি তার বিরক্তি প্রকাশ করবে?
- একজন ছেলে আরেকটি ছেলেকে পরীক্ষায় নকল করতে উৎসাহ দিচ্ছে। কীভাবে ছেলেটি তার বন্ধুকে বাধা প্রদান করবে?

- আমরা ৩টি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে ৩টি দলে ভাগ হয়ে কীভাবে দ্বিধাহীন যোগাযোগ করতে হবে তা চর্চা করলাম এবং কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে তা জানলাম।
- এবার আবারও শিক্ষার্থীদের ৫টি দলে ভাগ করুন এবং দ্বিধাহীন যোগাযোগের উপর আরেকবার চর্চা করতে বলুন। এক্ষেত্রে ৫টি দলকে একটি করে ছোট গল্প বা ঘটনা দিন (সহায়ক তথ্য ৫.২-তে দেয়া আছে) এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন, কীভাবে প্রাপ্ত ঘটনাটির প্রেক্ষিতে দ্বিধাহীন যোগাযোগ করবে। দলীয় প্রস্তুতি নেবার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। অতঃপর একটি করে দলকে রোল প্লে এর জন্য আমন্ত্রণ জানান।

সবক'টি দলের শেষ হয়ে গেলে নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে দ্বিধাহীন যোগাযোগের বিষয়টি আলোচনা করুন।

- কী কী কৌশল অবলম্বন করে আমরা কার্যকরভাবে 'না' বলতে পারি?
- আমরা পরিস্থিতি ও ঘটনার প্রেক্ষিতে দ্বিধাহীন যোগাযোগ করতে পেরেছি কি না;
- মেয়েরা এই ধরনের যোগাযোগ করতে পারে কি না;
- এই ধরনের যোগাযোগ যেকোনো নেতিবাচক চাপ ও সহিংসতা মোকাবেলায় সহায়ক কি না।

ছ) মূল্যায়ন:

আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিখন অর্জন যাচাই করুন:

- কীভাবে আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্বিধাহীনভাবে যোগাযোগ করতে পারি?
- দ্বিধাহীনভাবে যোগাযোগের বিবেচ্য বিষয় কী কী?

সার-সংক্ষেপ:

দ্বিধাহীনতা এক ধরনের আত্মবিশ্বাস। এটা এক ধরনের আচরণ যার মাধ্যমে মানুষ অপরকে আহত না করে তার চাওয়া পাওয়া আর অনুভূতির ব্যাপারে অপরের সাথে কার্যকর যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। দ্বিধাহীনতা আমাদের নিজেদের সুরক্ষিত রাখে এবং মানসিক সুস্বাস্থ্য এবং সুসম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

মূল বার্তা

কোনো সহিংসতাই গ্রহণযোগ্য নয়। সহিংসতার বিরুদ্ধে আমরা দ্বিধাহীনভাবে কথা বলবো।

সহায়ক তথ্য ৫.২

গল্প ১

গল্প ২

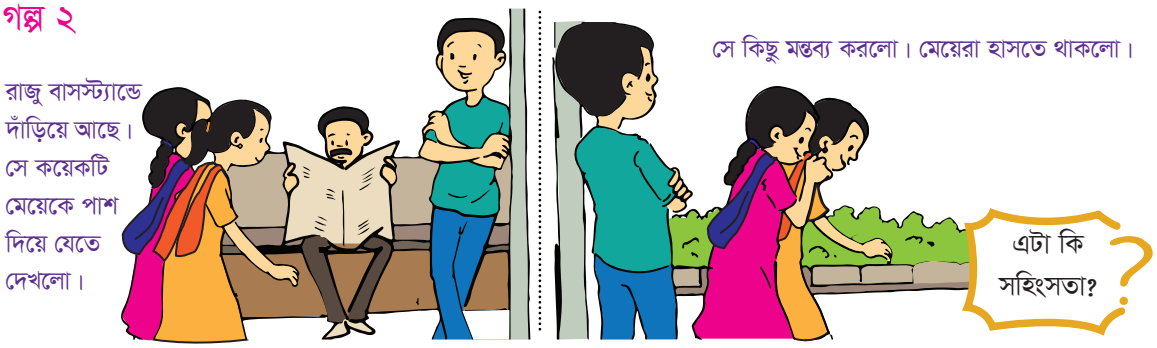

গল্প ৩

গল্প ৪

রাজিব বেশ লম্বা তাই ক্লাসের সবাই তাকে লম্বু বলে ডাকে
অ্যাই লম্বু!
সে কিছু মনে করে বলে মনে হয় না।
সে সাড়া দেয়
এই আমাকে কি ডেকেছো রবিন?
এটা কি সহিংসতা?

গল্প ৫

অনীতা খুব দুষ্টু। একদিন ক্লাসের সময় সে রুখসানার সাথে কথা বলতে থাকলো।
তোমরা দু'জন উঠে দাঁড়াও
শিক্ষক খুব রাগ করলেন...
দু'জন পঞ্চাশবার লেখো যে ক্লাস চলার সময় কথা বলবে না ।
এটা কি সহিংসতা?

অধিবেশন ৩: সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক চাপ এবং চাপ মোকাবিলা করার উপায়

ক) শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে শিক্ষার্থীরা–

- সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক সৃষ্ট চাপ চিহ্নিত করতে পারবে;
- সহপাঠী/সমবয়সী কর্তৃক সৃষ্ট চাপ মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

খ) সময়:

৪৫ মিনিট

গ) পদ্ধতি:

রোল-প্লে/ ভূমিকাভিনয় এবং আলোচনা

ঘ) উপকরণ:

রোল-প্লের দৃশ্যপট

ঙ) শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন, কৈশোরে বন্ধুত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ, তবে বন্ধুত্ব রক্ষা করা কঠিনও হতে পারে। এ সময় একাকী লাগা স্বাভাবিক। এ কারণে অনেক সময় আমরা কীভাবে বন্ধুদের খুশি করবো তা ভেবে দুশ্চিন্তায় থাকি এবং একারণে কখনো কখনো আমরা বন্ধুদের খুশি করতে গিয়ে নিজেদের ক্ষতি হয় এমন কাজও করে ফেলি। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন তাদের এমন কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা যেখানে তারা কোনো কিছু করতে চায়নি কিন্তু বন্ধুদের চাপে পড়ে তাদের করতে হয়েছে। দু'একজনের কাছ থেকে উত্তর শুনে নিন। তাদের বুঝিয়ে বলুন, বন্ধুর চাপ কীভাবে মোকাবিলা করা হবে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। সহায়ক তথ্য ৫.৩.১ এর আলোকে চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী ধরনের বক্তব্য তুলে ধরা হয় তার কিছু উদাহরণ দিন এবং সহায়ক তথ্য ৫.৩.২ এর সাহায্যে প্রত্যাখান কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করুন।

চ) শ্রেণি কার্যক্রম:

এবার অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে ভাগ করুন এবং নিম্নলিখিত দৃশ্যপটগুলো থেকে একটি করে দৃশ্যপট অভিনয় করতে দিন। দলের অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে বলুন, প্রধান ভূমিকা অর্থাৎ চাপ প্রত্যাখানের অভিনয়ের জন্য দল থেকে একজনকে বাছাই করতে হবে যে চাপ প্রত্যাখানের কৌশলগুলোর যেকোনো একটি অভিনয় করে দেখাবে। এক্ষেত্রে 'আমার বক্তব্য' কৌশলটিও ব্যবহার করা যেতে পারে। দলের অন্য অভিনেতারা দৃশ্যে বর্ণিত কাজটি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে বা উৎসাহ দেবে।

১. কিছু সহপাঠী মিলে কিছু অশ্লীল ছবি দেখছে এবং তোমাকে দেখার জন্য চাপ দিচ্ছে। তুমি দেখতে আগ্রহী নও। এক্ষেত্রে তুমি কীভাবে না বলবে?

২. তোমার প্রিয় বন্ধুটিকে 'ক্ষ্যাত' হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং তোমার আরও কিছু বন্ধু তার সম্পর্কে বাজে কথা বলছে এবং তারা চায় তুমিও এতে যোগ দাও। এক্ষেত্রে তুমি কীভাবে তাদের নিষেধ করবে?

৩. তুমি এবং তোমার বন্ধুরা ছুটির সময় স্কুলের মাঠে খেলছো। এক সময় তোমার এক বন্ধু তোমাকে স্কুলের জানালায় ঢিল মারার জন্য বার বার প্ররোচিত করছে। তুমি কীভাবে নিজেকে বিরত রাখবে?

ভূমিকা অভিনয়ের সময় কীভাবে চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে ও কীভাবে তা দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করা হচ্ছে তা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। সহায়ক তথ্যের সাহায্যে সহপাঠী/সমবয়সীদের চাপ ও এর প্রভাব কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা আলোচনা করুন।

ছ) মূল্যায়ন:

নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলো দিয়ে আলোচনা করুন:

- সমবয়সীদের কর্তৃক সৃষ্ট চাপ কী কী?
- সমবয়সীদের কর্তৃক সৃষ্ট চাপ কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়?
- সমবয়সীদের চাপ মোকাবিলার ক্ষেত্রে দ্বিধাহীনভাবে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা কী?

সার-সংক্ষেপ:

বয়ঃসন্ধিকালে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সমবয়সীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। অনেক সময় বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সমবয়সীদের চাপ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব চাপ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজন আত্মসচেতনতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব।

মূল বার্তা

দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাবের মাধ্যমে সমবয়সীদের চাপসমূহ মোকাবিলা করা যায়।

সহায়ক তথ্য

৫.৩.১ চাপ কৌশল:

সমবয়সীরা বলতে পারে...

- সবাই এটি করছে অত ভয় পেও না
- কিছু সময়ের জন্য আমাদের এটা চেষ্টা করা উচিত
- তোমার বাবা মা কখনই জানবে না
- আমরা শুধুই মজা করছি
- এটি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না
- তুমি যদি যোগ না দাও তাহলে এসেছো কেনো?
- তুমি খুবই বিরক্তিকর

৫.৩.২ চাপ প্রত্যাখানের কৌশল:

প্রত্যাখান কৌশল	উদাহরণ
বিষয় পরিবর্তন করা	তুমি কি এ বিষয়ে শুনেছো...
ব্যাখ্যা করা	আমি অন্যকে হয়রানি করতে চাই না
ক্ষমা প্রার্থনা করা	দুঃখিত তোমাকে হতাশ করার জন্য, কিন্তু আমি এতে যোগ দিতে পারছি না
অজুহাত দেখানো	আমার অন্য একটি কাজ আছে
কারণ দেখানো	আমাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে
পুনঃনিশ্চয়তা দেয়া	আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। তোমার সব কাজে আমার যোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই
ধন্যবাদ দেয়া	প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমি অন্য কিছু করতে পছন্দ করি

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

Kingdom of the Netherlands
Canada
WITH FUNDING FROM AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION
UNFPA
PLAN INTERNATIONAL